প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬৬

প্রকাশক—ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭

গারোহিলের গুণ্ডা হাতী

চিত্র সূচী

লেখকের কথা

দেবতাত্মা হিমালয়ের চরণাশ্রিত ব্রহ্মপুত্র বিধৌত অসীম রহস্যে-ভরা কিম্বদন্তীর দেশ আসাম। অসংখ্য বন্য-প্রাণী অধ্যুষিতা রোমাঞ্চময় এর দীর্ঘ বিস্তৃত অরণ্যাঞ্চল। সে অরণ্য দূর থেকে সর্বদা হাতছানি দিয়ে ডেকেছে আমাকে। কিন্তু তাকে চোখে দেখার সুযোগ হয়নি আমার ১৯৭২ সালের এপ্রিলের আগে। সে সুযোগও হয়ত অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে থাকত যদিনা 'লালজী' অর্থাৎ গৌরীপুরের মধ্যম রাজকুমার শ্রীপ্রকৃতিশচন্দ্র বড়ুয়ার আমন্ত্রণ আসতো তার 'মেলা শিকার'—অর্থাৎ দড়ির ফাঁসে বুনো হাতী ধরার ক্যাম্প পরিদর্শনের জন্য।

গিয়েছিলাম এবং ফল লাভও হয়েছিল আমার চতুর্বিধ। প্রথমতঃ ভারতের প্রখ্যাত হস্তী বিশারদ লালজীর সঙ্গলাভ। দ্বিতীয়তঃ তাঁর বুনো হাতী ধরা ও শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ। তৃতীয়তঃ রাজবাড়ীর আপনকরা নিবিড় আতিথেয়তার মধ্যে দু'সপ্তাহ কাটিয়ে আলোচ্য রাজবংশের বিগত দেড়শত বছরের সযত্নে রক্ষিত শিকার ডাইরীগুলি অনুধাবন। চতুর্থতঃ, বিশেষ করে, গোয়ালপাড়া জেলার ভুটানি সীমান্ত সংলগ্ন তরাই অঞ্চল ও কাজিরাঙ্গা অভয়ারণ্যের বন ও বন্য-প্রাণী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন।

আলোচ্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে 'লেখকের কথা' দীর্ঘায়িত করার লোভ সম্বরণ করলাম। কারণ রাজবাড়ীর পূর্বোক্ত শিকার ডাইরীগুলি অসংখ্য রোমাঞ্চকর কাহিনীতে সমৃদ্ধ। সে কাহিনী সবিস্তারে কৌতূহলী পাঠক সমাজের গোচরে আনতে হলে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশনার প্রয়োজন আছে। নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে সে প্রয়োজন মেটানো ভবিষ্যতে সম্ভব হলে লেখক হিসেবে আমার বক্তব্যও ধারাবাহিকভাবে আসবে।

লালজীর আরণ্যক জীবনের অতীত ইতিহাস জানা নাকি পূর্ণ হয় না—যদি না তাঁর যৌবনের অবিস্মরণীয় রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনী 'গারো হিলের গুণ্ডা হাতী'র ঘটনাটি জানা যায়। 'অমৃত' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত আমার সেই রচনাটি দিয়েই আলোচ্য গ্রন্থের শিরোনামা ও বিষয়বস্তুর সূচনা।

লালজীর কথায় অরণ্য—আসামকে জানা নাকি পূর্ণ হয় না—যদিনা

অসমীয়া কিম্বদন্তীর 'পাগলীর সাহান' জানা যায়। আমার রচিত যুগান্তর সাময়িকীতে প্রকাশিত সেই কাহিনী তাই এই গ্রন্থে সংযোজিত হোলো।

আসামের বিখ্যাত শিকারী বন্ধুবর শ্রীমুনীন্দ্র নারায়ণ বড়ুয়ার মত্ত হাতী শিকারের লোমহর্ষক কাহিনীগুলি 'অমৃত' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হলেও এই গ্রন্থে তাব পুনঃ সংযোজন নিশ্চয়ই বিষয়বস্তুর রোমাঞ্চ বাড়াবে।

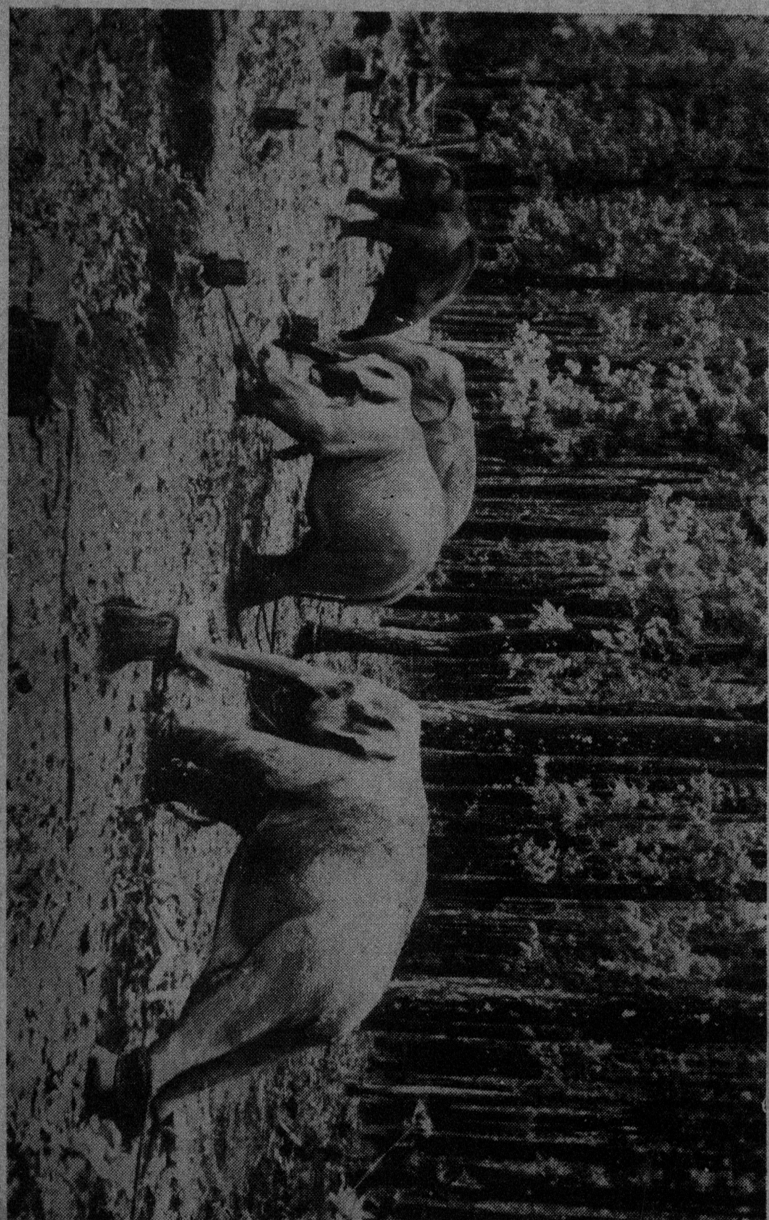
বাঘ শিকারের কয়েকটি রোমাঞ্চকর কাহিনী সংযোজিত হয়েছে শুণ্ড-দন্ত বিষয়ক একঘেয়েমী কাটাবার জন্যে, এবং সরকারী খেতাবধারী জাতীয় পশুর প্রতি যথাযোগ্য কৌলিন্য প্রদর্শনেব উদ্দেশ্যে।

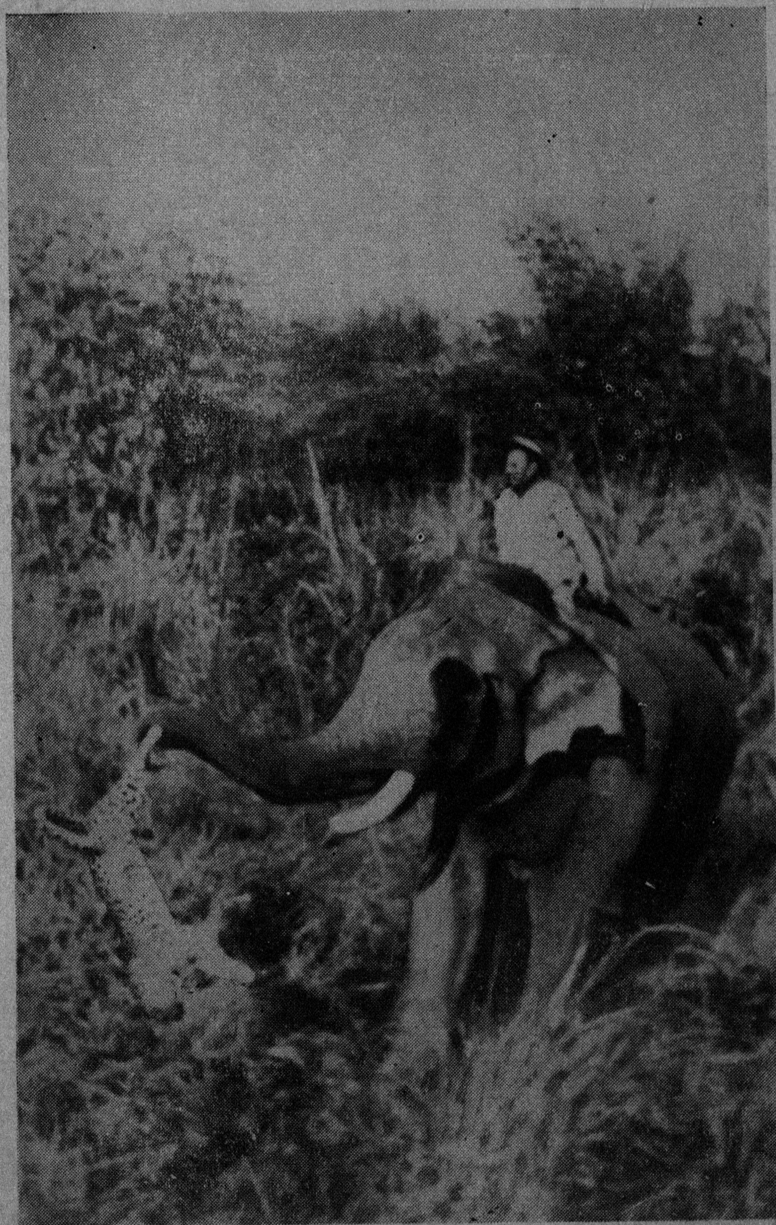
আসামের যে বাজবংশ এই বিস্ময়কর শিকার ঐতিহ্যের অধিকারী সেই বংশের সামাজিক আচার ব্যবহার রীতি-নীতি দৃষ্টিভঙ্গী তথা প্রাচীন ইতিহাস জানবার আগ্রহ স্বাভাবিক। বর্ত্তমান বংশধরদের কাছ থেকে সংগৃহীত সেই ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচ্য প্রসঙ্গে বর্ণিত হোলো। বলা-বাহুল্য সেই ইতিহাস অতীব কৌতূহলোদ্দীপকও বটে।

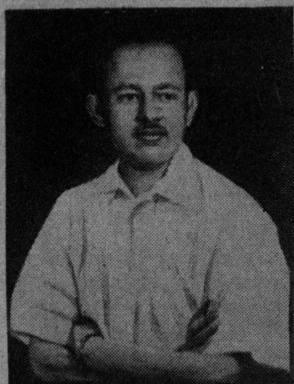
এই গ্রন্থের প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের সহৃদয় পরিচালক ও উৎসাহী কর্মীদের জানাই আন্তবিক ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ জানাই পাণ্ডুলিপির প্রস্তুতিপর্বের নীরব ও সক্রিয় সহযোগী শ্রীমতী আভা বসুকে। সর্বোপরি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই আমাব রচনানুরাগী পাঠকমহলকে যাদের অনুরাগ আমার সার্থকতার একমাত্র মাপকাঠি।

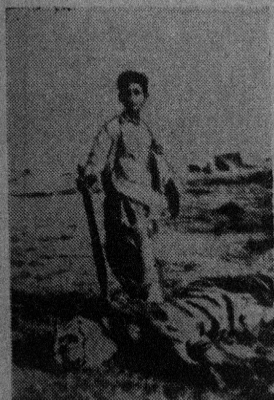
বিশ্বনাথ বসু













গারোহিলের গুণ্ডা হাতী

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আর পারছি না। যে মৃত্যু আমার সামনে অপেক্ষা করছে তা যে অতি বীভৎস ও যন্ত্রণাদায়ক হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। আত্মরক্ষার আর উপায় দেখছি না। মূর্তিমান যমদূত যেন একটি কুৎসিত বিভীষিকার মত সর্বক্ষণ আমাদের পিছনে লেগে রয়েছে। মাত্র একটি শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্রের অভাবে আমি আজ এই মহা দুর্বিপাকের সামনে অসহায়। অথচ এই মুহূর্তে আমার এস্টেটের অস্ত্রাগারে আছে থরে থরে সাজানো হরেক রকমের আগ্নেয়াস্ত্র। দুইশত কর্মচারীর মধ্যে প্রায় একশত জনই হচ্ছে এস্টেটের দক্ষ অফিসার। তাছাড়া আছে ডেঁটেল ও সাহসী পাইক, পেয়াদা, বরকন্দাজের দল। বিষয় সম্পত্তির আয়ও প্রচুর। এ হেন আমি আমার প্রিয় পরিবার পরিজনদের ফেলে এসে এই জংলী কাজে নেমে বহু দূরবর্তী পাহাড়ী অরণ্যের অভ্যন্তরে অতি দুর্ধর্ষ এক বন্য-পশুর হাতে আজ বন্দী। কি প্রয়োজন ছিল আমার এই সখের অভিযানের? এর পিছনে তো আমার কোন অপরিহার্য অর্থ নৈতিক প্রয়োজনের তাগিদ ছিল না। তবে ?,

অনুতাপে জ্বলছেন লালজী। অসংখ্য প্রশ্ন তাঁর মনে! অসহনীয় চাপ পড়ছে তাঁর স্নায়ুর ওপর। শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিহ্বল তিনি। এ যাত্রায় প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে এই জংলী সখ তিনি সারা জীবনের জন্যই মন থেকে ঝেড়ে ফেলবেন। আর কখনও এই বিপজ্জনক কাজে নামবেন না—এই তাঁর প্রতিজ্ঞা।

উপরোক্ত তথাকথিত 'প্রতিজ্ঞার' উল্লেখসহ আসামের গৌরীপুর

রাজ-পরিবারের মেজ রাজকুমার শ্রীপ্রকৃতিশচন্দ্র বড়ুয়া ওরফে লালজীর মুখ থেকে তাঁর যৌবনের সেই অতি লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার বৃত্তান্তটি শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার
এপ্রিল মাসে।

মার্চের শেষ থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটানা মাস দেড়েকের ওপর লালজীর অতিথি ছিলাম আমি হিমালয়ের পাদদেশে ভুটান রাজ্য সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ ও আসামের দুর্গম তরাই অরণ্যে তাঁর বুনো হাতী ধরার ক্যাম্পে। এই সময়ের শেষ কয়েকটা দিন কেটেছে আমার গৌরীপুরে তাঁরই বাড়ীতে অতি আনন্দদায়ক পারিবারিক পরিবেশে।

লালজীর বৈঠকখানার আলমারীতে আজও রক্ষিত আছে এই রাজবংশের বিগত প্রায় দেড়শো বছরের অমূল্য তথ্যসমৃদ্ধ শিকার ডাইরীগুলি। অগাধ জ্ঞান ও আরণ্যক অভিজ্ঞতার অধিকারী লালজী নিজেও। অসংখ্য রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে।

অস্বীকার করিনা, আমি নিজে একজন একনিষ্ঠ 'স্টোরি হাণ্টার'ও বটে। তাই এই দুর্লভ সুযোগের সদ্ব্যবহারও করেছিলাম পুরো মাত্রায় যে কয়দিন সেখানে ছিলাম।

সবে কলকাতায় ফিরেছি বিহারের পালামৌ ন্যাশন্যাল পার্কের বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ প্রোগ্রাম সেরে। ঘরে ফিরে বন-পাগল মনটার আমার উড়ো উড়ো ভাবটা কাটেনি তখনও। এমন সময় লালজীর ৩১-৫-৭৩ তারিখের পত্রটা হাতে এল—

লালজী তাঁর পত্রের শেষ কয়েকটি লাইনে লিখছেন—'প্রিয় বোস সাহেব, এবার গাজালী শিকার হয়নি'।

(বর্ষাকালে জঙ্গলে কচি ঘাস গজালে তা খেতে বুনো হাতীর পাল নামে। দড়ির ফাঁসে বর্ষাকালের সেই হাতী ধরার অভিযানকে বলে 'গাজালী শিকার'। —লেখক।)

তিনি লিখছেন, 'বড় একঘেয়ে লাগিতেছে। জঙ্গলে না যাইতে পারিয়া দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।'

বেশ যেন একটু ভারাক্রান্ত মনের অভিব্যক্তি লালজীর চিঠির শেষ কটি লাইনে।

লালজী হামেসা আমার কাছে নিজেকে 'জংলী' বলে পরিচয় দেন। তাই তাঁর পত্রের শেষ লাইন কয়টি পড়ে এই জংলী লোকটির জন্য সত্যই মনটা আমার সহানুভূতিতে ভরে গেল। কিন্তু একটু হাসিও পেল পেছনে ফেলে আসা ১৯৪৫ সালের রোমাঞ্চ-ঘেরা দুর্গম অরণ্যে সেদিনের সেই সৌখীন অভিযাত্রী লালজীর অস্থির ও বিহ্বল মনের প্রতিজ্ঞার কথা ভেবে।

কিন্তু একথাও তো সত্য যে পরবর্তীকালে অপ্রতিরোধ্য অরণ্যের হাতছানি লালজীকে কোনদিনই তাঁর গণ্ডীবদ্ধ ঘরের মায়ায় আবদ্ধ থাকতে দেয়নি। অবিস্মরণীয় রোমাঞ্চের অফুরন্ত প্রবাহের মধ্য দিয়ে পাড়ি দিয়ে এসে লালজীর প্রৌঢ় জীবনের অপরাহ্ন আজ সর্বোতোভাবেই অরণ্য প্রেমে বিভোর। তাইতো ঝড়জল মাথায় করে এমনকি বর্ষার কয়েকটা মাসের 'গাজালী শিকারে' বেরুতে না পারলে লালজীর দম বন্ধ হবার উপক্রম হয় এবং পত্র লিখে এবারের সেই দুঃখের কথাটি তিনি আমাকে জানিয়েছেন।

১৯৪৫ সাল। আসাম উপত্যকার দক্ষিণে অবস্থিত দীর্ঘ বিস্তৃত গারো হিলের গভীর অরণ্যাঞ্চল। এ অঞ্চলে বুনো হাতী ধরার এবারের মহল ছিল ১৯৪৪ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৪৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত। লালজীর মূল ক্যাম্প পড়েছে অবিভক্ত বাংলার মৈমনসিং জেলার সীমান্ত সংলগ্ন ডালু নামক গ্রামের দক্ষিণ দিককার পাহাড়ী ঢালুর গায়ে এক বিক্ষিপ্ত চাতালে।

গৌরীপুর দলের এবারকার অভিযানে ছিল একসঙ্গে গড় অর্থাৎ খেদা এবং মেলা শিকারের যৌথ ব্যবস্থা। (পোষা হাতীর পিঠে

চড়ে বুনো হাতীর দলের মধ্যে ঢুকে বেছে বেছে কম-বয়সী হাতী দড়ির ফাঁসে ধরাকে বলে 'মেলা শিকার'—লেখক)।

খেদা তৈরী হয়েছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে হাতী চলাচলের দণ্ডীর (পথের) মুখে। মূল ক্যাম্প থেকে খেদার দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যে। খেদা চালু হয়েছে মহলের সুরু, অর্থাৎ গত বছর অক্টোবরের প্রথম থেকেই। কিন্তু অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে খেদায় কোন হাতী পড়েনি। এমনকি এতদঞ্চলে জংলী হাতী চলাচলের কোন হদিসও মেলেনি।

বুনো হাতীর দলকে দূর থেকে সুকৌশলে নির্দিষ্ট দিকে খেদিয়ে এনে খেদার মধ্যে ঢোকাতে হয়। তার জন্য আগে থেকে দরকার তাদের অবস্থান এবং বন-পরিক্রমার সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা। সে কাজে সর্বদলেই সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত থাকে অগ্রগামী খোঁজারু বাহিনী।

ডালু গ্রামের মূল ক্যাম্পে বিরাট দলবলসহ তিন মাস বেকার বসে থেকে লালজীর দুর্ভাবনা বাড়ছে। বুনো হাতী ধরার জংলী কাজের পেছনে গৌরীপুরের তৎকালীন ধনী রাজপরিবারের মেজ রাজকুমারের যুব মনে ব্যবসায়িক লক্ষ্য ও আগ্রহের চাইতে নেশার ঝোঁকটাই ছিল প্রবল। কিন্তু সে কাজে দৈনিক খরচাও প্রচুর। তাই দুর্ভাবনাও স্বাভাবিক।

জানুয়ারী মাসের হাড় কাঁপানো শীতের সন্ধ্যা। তাঁবুর সামনের ধুনিটা উসকে দিয়ে তা থেকে চিমটের মাথায় এক টুকরো আগুন তুলে নিয়ে লালজী একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ আয়েস করে বসলেন। গড়ের ব্যবস্থাপনায় যারা ছিল তাদের আট জনের একটি খোঁজারু দল হাতীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে অনেক দিন হোল। তারা এখন কোথায় এবং কবে কি খবর নিয়ে ফিরবে সেই চিন্তাই লালজীর মনে প্রতিদিন ঘুরপাক খায়। কিন্তু সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে লালজীর মনে ভাবান্তর ঘটে। নিবিড়

বনের নির্জনতা যেন নিকষ কালো পর্দার আড়ালে থেকে তখন লালজীর সঙ্গে কথা বলে। সে কথা বোঝার মত মন ও শোনার মত কান থাকা দরকার। লালজীর তা আছে বলেই প্রতিদিন তিনি সাগ্রহে সেই আঁধার-ঘেরা আরণ্যক রূপান্তরের প্রতীক্ষায় থাকেন।

রাতের শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে ধুনির উষ্ণতার আমেজে চোখ বুজে কান খাড়া করে লালজী আড়ি পেতে অপেক্ষা করেন। গভীর রাতের বন ও বন্যরা কি ভাষার ইঙ্গিত ইসারায় পারস্পরিক ভাব বিনিময় ও সাবধানী সাড়ার আদান-প্রদান করে তা জানবার অসীম কৌতূহল তাঁর।

প্রতিদিন দু-বেলা কিছু সময় পোষা হাতীদের নিজের হাতে খাওয়ানো লালজীর দৈনন্দিন অবশ্য করণীয় কার্যক্রম। সেদিনও বিকালের সে কাজ সেরে এসে লালজী ধুনির পাশে বসে সবে একটি সিগারেট ধরিয়েছে এমন সময় খোঁজারু দলের দুজন ফিরে এসে খবর দিলে যে এখান থেকে পশ্চিমে বহু দূরে গারো হিল এবং মৈমনসিং ও রংপুর জেলার সংযোগস্থলে একটি গ্রাম আছে—নাম মহেন্দ্রগঞ্জ। গড় থেকে সেই গ্রামের দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ মাইল। ঐ মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে গারো হিলের জঙ্গলের চার মাইলের ভেতর বিরাট একদল হাতীর খোঁজ পাওয়া গেছে। কিন্তু তাদের তাড়িয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। সত্বর কোন ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বিলম্বে হাতীগুলো এলাকা ছেড়ে চলে যেতে পারে। তবে সে দলের রক্ষক হচ্ছে একটা গুণ্ডা হাতী। খোঁজারুরা সভয়ে একথাটাও জানাতে ভুললো না।

খবর শুনেই লালজীর মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। কালবিলম্ব না করে পরদিন ভোরেই তিনি রওনা হওয়া মনস্থ করলেন। এবং দলবলকে রাতের মধ্যে গোছগাছ করে নিতে বললেন।

পূর্ব সিদ্ধান্ত মত পরদিন ভোরে ফর্সা হওয়ার আগেই গৌরীপুর

এস্টেটের ভেটারনারি সার্জেন ওরফে 'ভেট'এর ওপর মূল ক্যাম্পের দায়িত্ব রেখে সাতটি পোষা 'কুনকি' হাতী সহ ফাঁদি, মাহুত, কামলা (হাতীর খাবার দেয় যে) ও অন্যান্য লোকজন এবং দুজন খোঁজারু গড়ওয়ালা—মোট চব্বিশজনের একটি দল নিয়ে লালজী বহুদূরবর্তী মহেন্দ্রগঞ্জের উদ্দেশ্যে পঞ্চাশ মাইলের দুর্গম কষ্টসাধ্য পথে যাত্রা শুরু করলেন। আজীবনের বিশ্বস্ত অনুচর ভবেনও এ যাত্রায় তাঁর সঙ্গী। একমাত্র রাইফেলটি লালজী 'ভোট'এর হেফাজতে ছেড়ে গেলেন ক্যাম্পের নিরাপত্তার প্রয়োজনে। নিজের সঙ্গে নিলেন শুধু কুড়ি পঁচিশটি ছররা ও এল জি জাতীয় গুলি সমেত দোনলা বন্দুকটি।

বিগত তিন মাসের ব্যর্থ প্রতীক্ষা জনিত অসহিষ্ণুতার মধ্যে যাত্রাবম্ভের প্রাক্কালে স্বাভাবিকভাবেই লালজীর মনে একথা বিন্দুমাত্র কল্পনায় আসেনি যে পূর্বোক্ত বুনো গুণ্ডাটার দুর্ধর্ষ আক্রমণে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই পথিমধ্যে তাঁকে দলবলসহ জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন হতে এবং নিরাপত্তামূলক উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে অসহায়ভাবে সম্পূর্ণরূপেই অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করতে হবে।

সময় ও পরিস্থিতিটা অত্যন্ত জরুরী। লালজী তাই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে পঞ্চাশ মাইলের দুর্গম পাহাড়ী বনপথ মাত্র তিন দিনের মধ্যে পাড়ি দিয়ে এসে মূল খোঁজারু দলের সঙ্গে মিলিত হলেন।

এলাকাটির জমি সরকারী খাসের। কিন্তু জঙ্গল সরকারী রিজার্ভ জঙ্গল নয়। মধ্যে মধ্যে যেখানে জল আছে সেখানেই আট দশটি ঘর নিয়ে একটি গ্রাম। গ্রামবাসীদের অধিকার আছে এখানকার জঙ্গল এলাকায় 'জুম' চাষ করবার। গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে ঠাসা মুলি বাঁশের জঙ্গল। মহেন্দ্রগঞ্জের সংলগ্ন দ্বিতীয় গ্রাম ছেঙ্গাপাড়া। এই দুটি গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে একটি পরিস্কার জলের ঝোরা আছে। উপযুক্ত মনে করে এই ঝোরার পাড়েই লালজী অস্থায়ী ক্যাম্প বসাবার নির্দেশ দিলেন। প্রতিটি তাঁবুর সামনে জ্বললো

ধুনির আগুন। ক্যাম্পের গোছগাছ, পোষা হাতীদের তদারকি, রান্নাবান্নার ব্যবস্থা প্রভৃতি হরেক রকমের কাজের চাপে গোটা ক্যাম্পে কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেল।

ধুনির সামনে একটি বেতের মোড়ায় সিগারেট মুখে লালজী বসে। পাশে ভবেন ও বড়-ফাঁদি। ওদিকে ধুনিকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে গড়ওয়ালা খোঁজারু দলের সবাই উবু হয়ে বসে আগুন পোহাচ্ছে ও লালজীকে বুনো হাতীর দলটির বৃত্তান্ত শোনাচ্ছে। মাদী, মদ্দা, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বিরাট দল। তবে গুণ্ডাটার হালচাল ভাল নয়। বড্ড একরোখা মনে হয়। কথাটা বলে ওরা একটু নড়ে চড়ে বসে। লালজী তাদের আশ্বস্ত করেন।

পুবে ক্যাম্পের পেছনে ঝোরা। সামনে পশ্চিমে মুলি বাঁশের সবুজে ঢাকা দীর্ঘ বিস্তৃত ঢেউ খেলানো পাহাড়ী টিলার সারি। নাক বরাবর সব চাইতে উঁচু টিলার নেড়া শিরদাঁড়াটা 'জুম' চাষের জুলুমের সাক্ষী। পেছনে তার অস্তগামী গোধুলি সুর্যের সোনালী আভা। মুলি বাঁশের ঝাড়ে হিমেল হাওয়ার দোলা।

ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছিল। কাপটা খালি করে লালজী মুখে খোঁজারু দলের খবরাখবর নিচ্ছেন আর আড়চোখে নেড়া পাহাড়ের শিরদাঁড়াটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন।

বড় ফাঁদি বলে—'আজ্ঞে, তাহলে কি কাল সকালেই দড়ি কাছি নিয়ে বুনোর দলে ঢুকে একবার চেষ্টা চরিত্তির করে দেখবো দু-একটাকে তোলা যায় কিনা? না--খেদিয়ে গোটা দলটাকে গড়ের দিকিই চালান দেব?'

বড় ফাঁদি তার প্রশ্নটা পেশ করে উত্তরের আশায় উসখুস করে। কিন্তু লালজী নিশ্চুপ। কৌতূহলী দৃষ্টি তাঁর তখন পাহাড়টার মাথায় নিবদ্ধ।

'ত্যাখতো ভবেন, টিলার মাথায় ফাঁকায় হাতীর লাইন এগোয় নাকি রে?'

উপস্থিত সবাই একসঙ্গে চোখ ঘোরায় লালজীর দৃষ্টি বরাবর।

কি অভাবনীয় কাণ্ড? টিলার মাথার জুম চাষের ফাঁকা জমিটার ওপর দিয়ে একপাল হাতী হেলে দুলে লাইন দিয়ে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। পেছনের রক্তাভ উর্ধ্বাকাশের পটভূমিকায় তাদের ধূসর বর্ণের দেহ পরিষ্কার দেখা যায়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এক দুই তিন করে একষট্টিটি বিশালদেহী বুনো হাতীর এই সুশৃঙ্খল সান্ধ্য শোভাযাত্রা ক্যাম্পের সবাই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে লক্ষ্য করলো। লালজীও বিস্মিত বিমুগ্ধ।

জলভরা ঝোরার পাড়ে কচি ঘাসের জমি। ক্যাম্পে শুয়ে গভীর রাতে হাতী চলাচলের সাড়ায় বোঝা গেল বুনোর দলটি লোভে লোভে এসে নেমেছে ঐ ঘাস জমিতে।

বড় ফাঁদি তার বিছানায় শেষ রাত থেকেই উসখুস করছে। পূবে ফর্সা দিতেই খোঁজারু দলের কয়েকজন ওদিক পানে কিছুটা উঁকি ঝুঁকি দিয়ে এসে জানালে যে দলে কম বয়সী বেশ কয়েকটা হাতী আছে।

ভোরে লালজী উঠতেই শলা-পরামর্শ করে ঠিক হোল যে হাতীর মূল দলটাকে পূবে খেদার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং সেটাই আসল কাজ যার জন্য এতদূর আসা। কিন্তু তার আগে এখানে ঝোরার পাড়ে, যদি সম্ভব হয়, কয়েকটা ছোকরা হাতীকে মেলা-শিকারে পাকড়াও করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

বড় ফাঁদির নেতৃত্বে পোষা সাতটি কুনকী হাতী সহ ১৪ জনের দল তৈরী হোল। গড়ওয়ালারা আটজন তাদের তিনটি বন্দুকসহ সঙ্গী হোল। লালজীও প্রস্তুত হয়ে এলেন। এই অভিযানে তিনিও সক্রিয় অংশ নিতে চান। তিনটি মাস বৃথাই গিয়েছে। এই প্রথম সুযোগ যেন ব্যর্থ না হয়। লালজীর মনে নতুন আশা ও উৎসাহের চাঞ্চল্য।

হাওয়ার গতি বুঝে সুসজ্জিত দল নিয়ে সতর্ক পদক্ষেপে লালজী জঙ্গলে ঢুকলেন। বড় ফাঁদির বক্তব্য হচ্ছে—গুণ্ডাটা দলের কোন দিক পাহারা দিচ্ছে বুঝে নিয়ে তবে এগুতে হবে। খোঁজারুদের নির্দেশ দেওয়া হোল তারা যেন মাঝে মাঝে গাছে উঠে গুণ্ডাটার অবস্থান এবং বাচ্চা হাতীগুলোর চলাচলের খবর ইশারায় জানায়। নির্দেশমত খোঁজারুরা জানালে যে—সেই বিরাট দলের হাতীগুলো ঝোরার পাড় বরাবর বহুদূর পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে একমনে চরে বেড়াচ্ছে। গুণ্ডাটা এদিকে নজরে আসছে না।

যাই হোক খোঁজারুদের ইশারার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ও নির্ভুল পথে এগিয়ে গুণ্ডাটাকে এড়িয়ে অতি সহজে ঝটপট বাচ্চাদের চারটাকে ধরে ফেলা গেল।

কিন্তু এতে তখনকার মত হাতীর দলে কোনরূপ চাঞ্চল্যও দেখা গেল না। ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হোল দড়ি-দড়ার ধর-পাকড়ের ঘটনাটা কচি ঘাসে উদর পূর্তির ব্যস্ততা ও অন্যমনস্কতার মধ্যে হাতীরা বিশেষ করে বাচ্চাগুলোর মায়েরা যেন অনুধাবনই করতে পারেনি।

ফলে আসল কাজ হাসিল করে হল্লা ও বন্দুকের শব্দে উত্ত্যক্ত করতেই গোটা দলটাই হন্তদন্ত হয়ে সামনের টিলা টপকে আরও তিন তিনটে খাদ পেরিয়ে প্রায় চার মাইল পূবে চলে গেল। গড়ওয়ালারা কিছু দূর তাদের পিছু ধাওয়া করে গিয়ে ফিরে এসে জানালে যে হাতীরা পূবেই এগুচ্ছে। খবরে সবাই খুসী। এদিকে চারটি হাতীও ধরা পড়লো, ওদিকে দলটি যেদিকে আশা করা গিয়েছিল সেই গড়ের দিকেই এগুলো।

এতবড় একটা বুনোর দল তাদের বাচ্চাদের ফেলে এমন নির্লিপ্তের মত পিছু হটলো। ব্যাপারটা বেশ বেখাপ্পাই ঠেকে। আর সে কারণে বড় ফাঁদির মনটাও যেন কেমন কেমন করে।

বন্দী হাতী চারটির মধ্যে একটা ছিল শিশু হাতী। মা

ছাড়া হয়েই সে সমানে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে। আরণ্যক পারি-পার্শ্বিকের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়ে সে হয়ত ইতিপূর্বে মানুষের মুখ দেখেনি! মুখোমুখিও হয়নি হয়ত কখনও সেই মানুষের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত কুট কলা-কৌশলের। পৃথিবীর প্রথম আলো তাকে যে সবুজের সমারোহ দেখিয়েছে, হস্তিনী মায়ের নিবিড় সংস্পর্শে থেকে মমতাময়ী প্রকৃতি মায়ের যে মন-জুড়ানো স্নেহের স্বাদ সে পেয়েছে তা থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চায় না; চায় না বলেই সে পা চালায়। কিন্তু পারে না। চার পা তার বাঁধা।

এরা কারা? কেনই বা আমাকে এরা বাঁধলো? কি এদের মতলব?'

এত সব প্রশ্নের উত্তর বোঝা শিশু হাতীর বুদ্ধিতে কুলোয় না। না কুলোলেও এটা সে বিলক্ষণ বুঝছে যে তার চলবার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। যার জন্য এখন তার খুবই কষ্ট। আর এই কষ্টের সময় মায়ের অভাব তার অবোধ শিশু মনকে আরও বেশী আকুল করে তুলেছে। তাই সেই আকুলতা সে তার অবোধ্য বন্য ভাষায় সারাদিনই ব্যক্ত করেছে।

দিন গেল—রাত এল।

'এই সেই রাত যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাঘেরা তার আশপাশে ছুঁত ছুঁত করে ঘুরে বেড়াতো।' সেই সব রোমাঞ্চের কথাগুলো শিশু হাতীর কচি মনে একে একে উদয় হয়। তার বেশ মনে আছে—

'মা তখন তাকে নিজের দেহ দিয়ে আড়াল করে আগলে রাখতো। কোন বাঘ বেশী টাঁইটুই করলে দলের সঙ্গীরাও রুখে এসে মায়ের সাহায্যে দাঁড়াতো। একবারতো এক নাছোড়বান্দা বাঘকে মা বেগতিক দেখে গাছের ডাল ভেঙ্গে বাগিয়ে নিয়ে খেদিয়ে দিয়ে এসেছিল বহুদূর পর্যন্ত। আর একবার কি মজাটাই না হোল। এক ব্যাটা বেয়াড়া বাঘ তো কয়েক মাইল ধরে আমার

পিছু নিয়েছে। মা যত আমাকে এদিক-ওদিক করে তার দেহের আড়ালে রাখে বাঘ ততো ঝোপের ভেতর দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে এসে আমাকে তাক করে পায়তারা ভাঁজে। আমারও ভয় করছে, মাও স্বস্তিতে চরতে পারছে না। কতক্ষণ আর এভাবে চলতে পারে? শেষ পর্যন্ত যখন দেখা গেল যে সত্যই বাঘটাকে রোখা দায়, তখন মা মুখে একটা বিপদের সঙ্কেত করলে। অমনি দলের সবাই রুখে এসে দু-চারজনকে মায়ের সঙ্গে আমার পাহারায় রেখে অন্যরা ছুটে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে বাঘটাকে ঘিরে ফেললো। আটকা পড়ে বাঘের সে কি তর্জন গর্জন! চারিদিক থেকে সবার পায়ের দলাই মলাইতে ঝোপের ঘের যখন ক্রমে ক্রমে ছোট হয়ে এল বাঘ বেচারাও তখন ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। হম্বিতম্বিতে ভয় পাবার বান্দা এরা নয় বুঝে কিছু সময় ঘাপটি মেরে থেকে কোন এক ফাঁকে একজনের পেটের তলা দিয়ে সটকে পড়ে ল্যাজ গুটিয়ে এক ছুটে পগার পার। সন্ধ্যে থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত সেদিন এই ঝামেলায় মা আর আমিতো না খেয়ে না দেয়ে একেবারে নাজেহাল।'

রাত যত বাড়ে কত কথাই না শিশু হাতীর মনে পড়ে। কিন্তু আজকের এই ধরনের ঝুট ঝামেলায় সে আগে কখনও পড়েনি। চার পা আটকা পড়ার ব্যাপার-স্যাপার তার মোটেই ভাল লাগছে না। হাঁটার চেষ্টার টানাটানিতে ব্যথায় পা টাটাচ্ছে। ভয়ও বাড়ছে। এই সময় দলবল নিয়ে মা যে কোথায় গেল? সারাদিন ধরে ডাকাডাকিতেও শিশু-হাতী তার মায়ের কোন সাড়া পেলনা।

'আচ্ছা, মা যখন দেখছে আমি সঙ্গে নেই, তখন সে নিজে একটু খুঁজে পেতেও-তো দেখতে পারতো।'

অভিমানে গুমরে উঠছে শিশু-হাতীর মনটা।

পেছনে বিপদের সাড়া পেয়ে সাত সকালে হন্তদন্ত হয়ে দলের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্বে চলে আসতে হয়েছে। পেছন ফিরে দেখার

সময় ছিল না। তবে এই ধরনের পশ্চাদপসরণের সময় সবাই একসঙ্গে থাকবে এই হচ্ছে নিয়ম। থাকেও সবাই। কারণ, তাড়াহুড়োয় পা চালাতে গিয়ে খোঁজাখুঁজির সময় থাকে না কারো। এক্ষেত্রে সে-সময় ছিলও না সত্যি। কারণ, দলের ওপর এধরনের বিপদ এই প্রথম। তুমুল হৈ-হট্টগোলের মধ্যে মরি-বাঁচি করে এক ছুটে এতটা পাহাড়ী জঙ্গল ঠেলে এসে সবাই তাই এখন একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।

কিন্তু বাচ্চাটারতো পৌঁছতে এত দেরী হওয়া উচিত নয়। একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু না হলেও মা ছাড়া হয়ে থাকবার মত বয়স তার হয়নি এখনও—যদিও দলে ওর মত ছোট বয়সের মাতৃ-নির্ভরশীল শিশু আর নেই।

হস্তিনী মায়ের উদ্বেগ বাড়ে। মনও কেমন করে। মুলি বাঁশের ঠাসা জঙ্গলে ভরা খাদের অনেকটা জায়গা নিয়ে গোটা দলটা ছড়িয়ে আছে। বাচ্চাটা হয়ত এর মধ্যেই কোথাও ঘুরপাক খাচ্ছে। খুঁজে দেখা যাক।

মা সমানে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে সারা বাঁশবনে বাচ্চার খোঁজে। একে-ওকে জিজ্ঞেস করে। কেউ বলতে পারে না বাচ্চাটার কথা।

দলের বড় মাতব্বর হাতীদের স্বভাব হচ্ছে সামনাসামনি বিপদে তারা পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসে বটে, কিন্তু দলের সংখ্যা অর্থাৎ কে রইল বা গেল, তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। নবাগত কেউ দাঁতাল হলে দলের রক্ষক ও মাতব্বরদের মনে কৌতূহল জাগে। প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হলে লড়ালড়িও হয়ে যায় এক হাত। কিন্তু মাতৃনির্ভরশীল বাচ্চা দলছুট হলে সেক্ষেত্রে তার জন্য চিন্তা-ভাবনা ও দায়-দায়িত্বটা একমাত্র হস্তীনী-মায়ের ওপরই বর্তায়। বস্তুতপক্ষে প্রকৃতিগত এই ধরন-ধারনটা পশু-পক্ষীর মধ্যে একই রকমের।

দিনের শেষ। খাদের জঙ্গল এলাকাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে

কোথাও বাচ্চাটার পাত্তা মিললো না। এদিকে দলের আবার রাতের সফরে বেরুনোর সময় হোল। তারা তো এগুচ্ছে খাদ বরাবর সামনের দিকে। কি করা যায় এখন?

'বাচ্চা তো নিশ্চয়ই সকালের ঝামেলার সময় বে-পথে ছিটকে গিয়ে দিক ভুল করেছে। অচেনা এলাকায় সারাদিন হয়ত সে সমানে জঙ্গলের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকারও ঘনিয়ে আসছে। এই সময় কোন বাঘের সামনে পড়লে তার রক্ষে নেই। রক্তলোলুপ ঐ নখদন্তীদের শক্তি সাহস ও হিংস্রতার কথা মনে হতেই সন্তান-বৎসলা হস্তিনী মায়ের প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। দোমনাভাবে সে দলের লাইনের সঙ্গে কিছুটা এগোয় আবার থামে। কাতর নয়নে পেছনে তাকায়। হাওয়ার চাপে জঙ্গল নড়ে—শব্দ ওঠে। মা ভাবে ঐ বুঝি আমার বাচ্চা ফেরে।

সকালে ঘাসবনে গণ্ডগোলের পর থেকে সারাদিন পেটে দানা-পানি পড়েনি। সঙ্গীরা বাঁশবনে যা হোক কিছু খেয়ে নিয়েছে। কিন্তু সন্তানের চিন্তায় হস্তীনী মায়ের ক্ষুধা-তৃষ্ণার হুঁস ছিল না।

সঙ্গীদের লাইনের পেছনটা এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। এই মাত্র খাদের সামনের বাঁকটা ঘুরে গেল। দোটানায় দুলছে মায়ের মন। দু-একটা হাঁক ছাড়লে হয় না? বাচ্চাটা যদি নিকটবর্তী কোন এলাকায় থেকে থাকে, কানে গেলে নিশ্চয়ই ছুটে আসবে।

হস্তীনী-মা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সংকেত পাঠিয়ে দিয়ে কান খাড়া করে থাকে। একবার দু'বার তিনবার। বাচ্চার কোন সাড়া নেই। নিজের গলার আওয়াজটাই শুধু চারিদিকের পাহাড়ের কঠিন বুকে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনির কোরাস তুলে বার বার ফিরে আসে নিজের কানে।

পাহাড়ের দেওয়ালগুলোয় বোধহয় শব্দ আটকাচ্ছে। তাই হয়ত হস্তিনী-মায়ের জোরালো গলার ডাক যথাস্থানে পৌঁছলেও শিশু-সন্তানের ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর খাদের নীচে নামছে না।

সঙ্করত দলের অর্ধশতাধিক হাতীর জংলী দাপট ওদিক থেকে এখনও কানে আসছে। খুব বেশী দূরে এগোয়নি ওরা। মনে হয় এক জায়গায় চরছে। হয়ত খাবারের ভাল জায়গা ওটা। কাজেই বাচ্চার খোঁজে কিছু সময় টহল দিলেও দলটা হয়ত আপাতত নাগালের বাইরে যাবে না। উদ্বেগাকুল মায়ের প্রাণ আশায় বুক বাঁধে ও পা চালায় সকালের তাড়া খাওয়া ঘাস বনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমমুখী ফিরতি পথে।

টানাটানি দাপাদাপি কোন কিছুতেই মুক্ত হতে পারছে না হস্তী-শিশু। মায়ের উদাসীনতায় মনে অভিমান থাকলেও এই বিপদে সেই মন কিন্তু মাকেই বেশী করে কাছে পেতে চাইছে। বলা যায় না মা হয়ত জঙ্গলে তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। শিশু-হাতী প্রাণপণে ডাকের পর ডাক ছাড়ে যাতে সে ডাক তার মায়ের কানে পৌঁছয়।

হাড়-কাঁপানো শীতে জড়োসড়ো হয়ে ধুনির পাশে বসে আগুন পোহাচ্ছিল হাতীর পাহারাওয়ালারা। বাচ্চা হাতীটার চেঁচামেচিতে কান ঝালাপালা। তাকে শান্ত করানো যায়নি সেই সকাল থেকে। খাওয়াতে গেলে শুঁড়ের ঝাপটা মারতে চায়। মহা ঝামেলায় পড়া গেছে যাহোক। পাহারওয়ালারা বিব্রত। বিব্রত লালজী ও ক্যাম্পের অন্যান্যরাও। বড় ফাঁদি শুধু বিব্রত নয়, সন্ত্রস্তও বটে। জংলী হাতী ধরার পেশায় সারা জীবন কাটিয়ে মন তার আজ এমনই সংবেদনশীল যে, বিপদ আপদের সম্ভাবনার আঁচ আগে থেকেই তার অন্তর্মনে অস্বস্তি জাগায়। সেই অস্বস্তিতেই তার সারাটা দিন কেটেছে।

দুর্লক্ষণের ইঙ্গিতবাহী হস্তী শিশুর গলা ফাটানো চীৎকারে বৃদ্ধ ফাঁদি প্রথম রাতে তো এক মুহূর্তের জন্যও দুই চোখের পাতা এক করতে পারেনি। তাঁবুর মধ্যে কম্বলের নীচে শুধু এপাশ ওপাশ করেছে।

নিঝুম রাতের শিশির ভেজা পাতা থেকে জল পড়ে টপ টপ টপ। ঝিঁ-ঝি পোকার একটানা রি রি রি রি ডাকের একঘেয়েমি অন্ধকারের নিবিড়তাকে যেন ক্রমাগত বাড়িয়ে দিয়ে আরও জমাট ও শিহরণশীল করে তুলেছে।

বাচ্চাটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। তার ধরা গলার ভাঙা স্বর তীক্ষ্ণ অথচ কর্কশ সুরের রেশ তুলে মাঝে মাঝে সরব হচ্ছে—আবার ঝিমিয়ে পড়ছে। গহনবনে রাতের রোমাঞ্চকর পরিবেশে সরব ও নীরবতার মধ্যবর্তী সময়টা বড় অসাড় ও ভয়াবহ ঠেকে। ঠেকে বলেই পাহারাদাররা কানখাড়া করে থাকে। সে কানে মাঝে মাঝে ধরা পড়ে দূর থেকে ভেসে আসা বিশেষ ধরনের একটা তীক্ষ্ণ টানা আওয়াজ। অভ্যস্ত কানে সে আওয়াজ সনাক্তকরণে অসুবিধা হবার কথা নয়। তার তাৎপর্য বুঝতেও ওদের দেরী হয় না। তাই ধুনির আগুন উসকে দিয়ে পাহারওয়ালারা সতর্ক হয় ও একটু নড়েচড়ে বসে।

মাঝ রাতে একটু তন্দ্রাভাব এসেছিল। হঠাৎ বড় কাঁদি ধড়ফড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলো।

কে গো তোরা বাইরে?

—কারা জানি বাইরে ফিসফিসিয়ে কথা বলে—।

'স্বপ্ন দেখিনি তো?'

বড় ফাঁদির দোমনা ভাব। তবু ব্যাপারটা পরখ করে দেখা দরকার। তাঁবুর পর্দা ঠেলে সে বাইরে আসে। হাতীর পাহারাওয়ালারা দুজন দাঁড়িয়ে।

'কি খবর রে?'—বড় ফাঁদি কাঁচা ঘুমের চোক কচলাতে কচলাতে জিজ্ঞেস করে।

ওরা ফিসফিসিয়ে খবরটা দেয়। বড় ফাঁদিও কান খাড়া করে শোনে আওয়াজটা। জংলী হাতীর ডাকই তো বটে। আর ও-ডাকের অর্থ ওর জানা। ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না। লালজীকে খবর

দেওয়া হোল। ক্যাম্পের লোকজনও সব জেগে গেল। সবাই শুনলো বহু দূর থেকে ভেসে-আসা সেই বৃংহতি আওয়াজ। কিন্তু পাহাড়ে পাহাড়ে এলোমেলো প্রতিধ্বনির ভিড় কাটিয়ে সে-আওয়াজের নির্দিষ্ট দিক নির্ণয় করা সম্ভব হলো না। তবে সহজেই সবার বোধগম্য হোল যে, একটা অশান্ত ও উত্তেজিত জংলী হাতী চড়াই-উৎরাই ভেঙে সারা বনাঞ্চল চুঁড়ে বেড়াচ্ছে। এদিকে তার আওয়াজ কানে আসতেই বন্দী হস্তী-শিশুরও উৎসাহ বেড়েছে। সে তার ভাঙ্গা গলায় আবার সমানে চেঁচাচ্ছে।

উৎকণ্ঠার রাত্রি অতিক্রান্ত প্রায়। বড় ফাঁদি ভাবে—কোন একটা অজ্ঞাত অমঙ্গলের আশঙ্কা করে কাল সকাল থেকেই মনটা যে তার অস্থির হয়ে উঠেছিল, এখন বোঝা যাচ্ছে সেটা নেহাৎ অমূলক নয়।

পরিস্থিতি লালজীরও চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তিনি ভবেনকে তাঁর তাঁবু থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা আনতে বলে ধুনির পাশে বেতের মোড়ায় গিয়ে বসলেন। পৌষের রাত। জমাট শীত। গা মাথা কম্বলে ঢেকে শুধু কান দুটো খোলা রেখেছেন লালজী। ভ্রূকুঞ্চিত, দুশ্চিন্তার লক্ষণ।

একটি সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে লালজী জিজ্ঞেস করলেন—জংলীটার আওয়াজ কোন্ দিক থেকে আসছে ওরা কিছু অনুমান করতে পারে কিনা? ভবেনরা তখনও স্থির নিশ্চিত নয়। লালজী বড় ফাঁদিকে ডেকে পাঠিয়ে নিজে চোখ বুজে মাথা নীচু করে কিছু সময় চুপ করে বসে রইলেন। সবাই জানে এতে শব্দের দিক ও দূরত্ব বোঝার সুবিধে হয় এবং তিনি নিজে ও বিষয়ে যথেষ্টই পারদর্শী। জংলীটার ডাক তখনও মাঝে মাঝে ভেসে আসছে।

বড় ফাঁদি পাহারাদারদের সঙ্গে ওদিকে বাচ্চাটাকে খাওয়ানো ও তার ঘ্যানঘ্যানানি বন্ধের চেষ্টায় ছিল। খবর পেয়ে লালজীর কাছে এসে আগুনের তাপে একটু আরাম করে বসলো। চোখে-মুখে তার দুশ্চিন্তার ছাপ।

লালজী মুখ তুলে চাইলেন। সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে সূচীভেদ্য অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মুখের ধোঁয়াটা ধীরে ধীরে দমভরে একটু ত্যারসা লাইনে ছুঁড়ে দিলেন। উপস্থিত সবাই তাঁর বক্তব্য শোনার জন্যই সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। ঠিক এই সময় দূরের হাতীটা আর একবার ডাকলো।

'ডাকটা পুব দিক থেকেই আসছে—কি বলো হে ফাঁদি ?'

'আমি এখনও ঠাওর করতে পারছি না কর্তা।'

—বড় ফাঁদির গলায় উৎকণ্ঠার আভাস।

'আমার অনুমান—মাদী হাতীটাই তার বাচ্চার খোঁজে বেরিয়ে ঝোরার পাড়ে সেই ঘাস বনের দিকে এগোচ্ছে। এই সময় যদি বাচ্চাটার ডাক ওর কানে যায়, তাহলে ও নির্ঘাৎ জোর পায়ে ক্যাম্পের আশ-পাশে এসে হাজির হবে। তাতে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে দাঁড়াতেও পারে। কাজেই সময় নষ্ট না করে এখন থেকে প্রস্তুত থাকা দরকার।

লালজীর নির্দেশে বন্দুক, গুলি, বল্লম ইত্যাদি হাতিয়ারগুলো হাতের ধারে রাখা হোল। বন্দী বাচ্চা চারটির চারপাশে আরও কয়েকটি অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে নিরাপত্তামূলক বেড়াজাল দৃঢ়তর করা হোল।

বৃংহতি নাদে প্রমাণ হয় জংলীটা আরও নিকটবর্তী হয়েছে ; আর তারই আসার পথের পেছন দিক থেকে পুব আকাশের গায়ে ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠছে।

প্রভাতী সূর্যের সোনালী আলোর ছোঁয়ায় সুমধুর পাখীর গানে গৌরীপুরের রাজবাড়ীর যখন ঘুম ভাঙছে, ঠিক সেই সময় সেই বাড়ীরই এক খেয়ালী রাজপুত্র সুদূর গারোপাহাড়ের দুর্গম বনাঞ্চলের এক সুকঠিন চত্বরে বসে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারই সামনে সূর্যালোকের প্রথম প্রকাশকে আড়াল করে যে পাহাড়ী টিলাটি দাঁড়িয়ে আছে তার শীর্ষদেশে সন্তানহারা এক ক্ষিপ্তা হস্তীনীর আবির্ভাবের দুর্ভাবনায়।

কুয়াশায় ঢাকা বন-পাহাড়ীর আবছা আলো ফর্সা হতেই সবার নজরে পড়লো সেই নির্দিষ্ট টিলাটির মাথায় দাঁড়িয়ে হস্তিনী তার শুঁড় উঁচিয়ে গন্ধবাহী হিমেল বাতাসে হারানো সন্তানের হদিস নিচ্ছে।

বিপদে, আপদে, পথ চলতিতে হস্তী-কুলের সব চাইতে কার্যকরী ও নির্ভরযোগ্য সহায় হচ্ছে ওদের প্রখর ঘ্রাণশক্তি। কাজেই লালজী ইতিমধ্যে বিলক্ষণ বুঝে নিয়েছেন যে ক্যাম্পে হস্তিনীর উপস্থিতি অনিবার্য। প্রচণ্ড দাপটে লড়ে বাচ্চাকে সে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবেই। সেই লড়াইয়ে গোটা ক্যাম্পটাই না লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

ভবেন ও বড়-ফাঁদি লালজীকে জিগায়, 'কি নির্দেশ কর্তার?'

'মামলা যেন ঘোরালোই হতে চলেছে অনুমান করি। ডেঁটে দাঁড়িয়ে খেদিয়ে দিতে হবে জংলীকে। বেগতিক বুঝলে বাচ্চাকে ওর ছেড়ে দিতেও হতে পারে। তবে একটা অন্য ফন্দীও আমি ভাবছি। স্থানীয় লোকদের কাছে শুনেছি ক্যাম্প থেকে তিন-চার মাইল দূরে ছেণ্টাপাড়া নামে একটা খোলা মেলা এলাকা আছে। জংলীটা ক্যাম্পে হাজির হবার আগেই তিনটি পোষা কুনকি হাতীর পাহারায় চারটি বাচ্চাকেই আগেভাগে সেখানে পাচার করে দিলে কেমন হয়?

মতলবটা ভবেন ও বড় ফাঁদির মনে ধরে। সিদ্ধান্ত পাকা হতেই বারোজন লোক তিনটি পোষা কুনকিসহ বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আর সময় নষ্ট না করে জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে উল্টোদিকে পা চালালো ছেণ্টাপাড়ার উদ্দেশ্যে। তাদের ওপর নির্দেশ রইল পথে কোথাও বিপদ ঘটলে বাচ্চাদের ছেড়ে দিয়ে তারা যেন নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে। নির্বিঘ্নে ছেণ্টাপাড়ায় পৌঁছনো সম্ভব হলে দু-চার দিন সেখানে কাটিয়ে বাচ্চা হাতীদের একটু ধাতস্থ করে নিয়ে ঘুরপথে যেন গৌরীপুর চলে যায়।

এদিকে রইল বাকী চারটি কুনকি হাতী সহ ক্যাম্পের দশজন ও গড়ওয়ালারা আটজন—মোট আঠারো জন লোক।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই ঘটলো। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জংলী হাতী ক্যাম্পের সামনে এসে হাজির। বাতাসে বাচ্চার গন্ধ পেয়েছে সে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রনং দেহি মূর্তি তার। ক্যাম্পের লোকেরাও লালজীর নেতৃত্বে রুখে দাঁড়িয়েছে। প্রচণ্ড হৈ-হল্লা, টিনের আওয়াজ, বন্দুকের শব্দে জঙ্গল তোলপাড় হচ্ছে। ক্যাম্প রক্ষা না হলে পরবর্তী হামলা হবে গ্রামের ওপর। কাজেই গ্রামের লোকেরাও ওদিকে চীৎকাব করছে। এই অভাবনীয় একতাবদ্ধ প্রতিরোধেব সামনে জংলী হাতী আর এগোতে সাহস পেল না।

অগত্যা অভাগিনী হস্তিনী-মা তার শিশু-সন্তানের আশা ত্যাগ করে ব্যর্থ মনোরথে পিছু হটে জঙ্গলের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আর কখনও তাকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। দলে ফিবে এসেছিল কিনা বোঝা যায়নি।

গতকালেরই খবর ছিল মূল হাতীব দল পুবে এগিয়েছে। ওদের খেদিয়ে গড়ের পথে পাঠাতে হবে। কোন অবস্থাতেই দলটাকে নাগালের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। ব্যাপারটা জরুরী। কাজেই এখানে আর সময় নষ্ট করা চলবে না। লালজীর হুকুম—যত শিগগির সম্ভব চা-টা কিছু খেয়ে নিয়ে ক্যাম্প তুলে পুবে এগোও।

জংলী হাতীব দলের গতকালের গমন পথ অনুসরণ কবে আবার শুরু হোল পদযাত্রা।

জঙ্গল ঠেলে দুটো টিলা পেরিয়ে আসার পর পথে পড়লো মেগাপগিরি গ্রাম। গ্রামবাসীরা বললে—সামনের টিলাব খাদে হাতীর দল আছে। লালজীর নির্দেশে ঐ গ্রামেই ক্যাম্প বসলো। ফাঁদি ও গড়ওয়ালারা গেল হাতীর হদিস নিতে। ফিরে এসে ওরা জানালে—ওটা সেই আসল দলটাই। যাই হোক দলটার নাগাল পাওয়ায় সবাই খুশি। নিশ্চিন্ত মনে সবাই খাওয়া-দাওয়ার তোড়-জোড়ে মন দিলে।

পরদিন সকালে খোঁজ নিয়ে জানা গেল রাতারাতি হাতীর দলটা এলাকা ছেড়ে আরও পূবে এগিয়েছে।

'তোল-তোল, ক্যাম্প তোল—'

লালজার ব্যস্ততা ও তড়পানিতে হুড়ুদ্দুম ক্যাম্প গুটিয়ে নিয়ে সবাই ছুটলো আবার বিনা বাক্যব্যয়ে হাতীর পিছনে।

তিন চারটি টিলা ও খাদ পেরিয়ে এসে একটি গ্রাম পাওয়া গেল। সবাই খুব পরিশ্রান্ত। একটু বিশ্রাম দরকার। স্থানীয় লোকদের মারফৎ খবর পাওয়া গেল—দাবগিরি ও বাবাগিরি নামক দুটি গ্রামের মধ্যবর্তী জঙ্গলে হাতীর দল অবস্থান করছে। হিসাব মত তিন দিনে প্রায় পনের-বিশ মাইল পাহাড়ী পথ পাড়ি দেওয়া হয়েছে। এই এলাকায়তো হাতীর খাবারের কমতি নেই। সে বিচারে বিচরণশীল হাতীর দলের গতিবেগ যেন একটু বেশীই মনে হচ্ছে। এটা বোধহয় ওদের কিছুটা অস্থিরতার লক্ষণ। ওরা হয়ত আঁচ পেয়েছে যে মানুষ পিছু নিয়েছে। তাই চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টায় আছে।

গড়ওয়ালাদের পরামর্শ হোল দলটাকে এখন একটু দম নিতে দেওয়া হোক। ধীরে সুস্থে ওদেরকে ক্রমান্বয়ে খেদার পথেই চালাতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে এদিক-ওদিক সরে যেতে পারে।

গড়ওয়ালাদের পরামর্শ প্রণিধানযোগ্য। ওদের কথায় বড় ফাঁদিও সায় দিলে। ঠিক হোল এখন আর বুনোর দলে ঢুকে হাতী ধরা হবে না। ধরলে কুনকি হাতী ও দলের লোকও কমে যাবে।

গ্রামের অদূরে একটা ক্ষেত। সেখানেই ক্যাম্প বসানো হলো। সেদিন পৌষ সংক্রান্তি। অরন্ধন। রান্নাবান্নার ঝামেলা ছিল না। চিঁড়ে দুধ খেয়ে সবাই কতকটা চাঙ্গা হয়ে নিলে।

তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে লালজী ক্ষেতের অবস্থানটা একটু লক্ষ্য করছেন। ক্যাম্পের গা ঘেঁসেই গিয়েছে হাতীর দণ্ডি। পূর্ব

সন্ধানমত হাতীর দলটা আছে সামনে ক্যাম্পের পুবে। গত কয়েক দিন থেকে উত্যক্ত হাতীর দল যদি দিক পরিবর্তন করে পিছু হটে এসে আক্রমণ করে বসে তাহলেই সমূহ বিপদ। তাই ক্যাম্পের অবস্থানটা মোটেই নিরাপদ ঠেকছে না। আর মনের এই উদ্বেগ নিয়ে সময় কাটানোও দায়। তাই লালজী গড়ওয়ালা চারজনকে নির্দেশ দিলেন এগিয়ে গিয়ে হাতীর দলের পাত্তা নিয়ে হাতী যাতে পশ্চিমে ঘুরতে সাহস না পায় তার জন্য দণ্ডিব মুখে আগুন জ্বেলে প্রতিরোধ তৈরী করে রাখতে।

গড় বা খেদা প্রথায় হাতীধরা পেশাদা‹ দলগুলোকে সরকার থেকে গাদা বন্দুক দেওয়া হোত। আলোচ্য গড়ওয়ালাদের কাছেও সরকারী বন্দুক ছিল। লালজীর নির্দেশে তার দুটো নিয়ে গড়-ওয়ালাদের মধ্য থেকে বগাবুড়ো, খড়গেশ্বর ও আরো দুজন রওনা হয়ে গেল হাতীর দণ্ডি বরাবর।

শীতের দুপুর। ফলাহারের পাট আগেই চুকেছে। গড়ওয়ালারা বেরিয়ে গেছে ঘণ্টা দুই হোল। নিশ্চিন্ত মনে ক্যাম্পের সবাই রোদ পিঠ করে বসে গল্পগুজব করছে। এমন সময় পূর্বোক্ত গড়ওয়ালাদের চারজনের তিনজন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসে জানালে যে বগাবুড়োকে গুণ্ডা হাতীতে মেরে ফেলেছে। আচমকা খবরটা শুনে তো সবাই হতভম্ব। লালজীও সন্ত্রস্ত। ঘটনাটা যে অতি অভাবনীয় ও লোমহর্ষক সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু এই বিপদের মধ্যেও ধীর মস্তিষ্কে পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে হবে।

বগাবুড়োর হাতে একটা গাদা বন্দুক ছিল। সেটা ও তার লাশটা উদ্ধার করা দরকার। কিন্তু গুণ্ডাটা এখন কোথায় কিভাবে আছে কে জানে। বড়ই বিপজ্জনক পরিস্থিতি। কি করা যায়?

লালজীর উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে বড় ফাঁদি, কানন সিং ফাঁদি ও রামেশ্বর এগিয়ে এসে জানালে যে তারাই যাবে মৃতের লাশ ও বন্দুক উদ্ধার করতে। লালজীর বুক ভরে গেল এই বিপদে তাঁর

দলের কর্মীদের কর্তব্যবোধ ও সাহসিকতার পরিচয় পেয়ে। ওদের দেখাদেখি অন্য গড়ওয়ালাদের তিনজনও প্রস্তুত হোল। কিন্তু ঘটনাস্থলটা দেখাবে কে? বগাবুড়োর যে তিনজন সঙ্গী জান নিয়ে ফিরেছে তাদের কেউ আর ভয়ে যেতে চায় না। বড়-ফাঁদি অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে সাহস দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত খড়গেশ্বর রাজী হোল। গুণ্ডাটার পুনরাক্রমণের ঝুঁকি নিয়েও ওদের সাতজনের দলটি তখন এগুলো ঘটনাস্থলের দিকে।

বড়-ফাঁদির হাতে ক্যাম্পের বন্দুকটি। লালজী ক্যাম্পের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে ওদের মঙ্গল কামনা করলেন।

বেলা পড়ে আসছে। উদ্ধারকারী দলের এখনও পাত্তা নেই। লালজীর উদ্বেগ বাড়ে। ক্যাম্পের সামনে হাতী-দণ্ডি ধরে সমানে পায়চারি করছেন তিনি ওদের ফেরার অপেক্ষায়। কয়েকদিন ধরে ওঁর মনের ওপর বড় বেশী চাপ পড়ছে।

সন্ধ্যার মুখে মুখে বড়-ফাঁদিরা ফিরে এল শুধু বন্দুকটা উদ্ধার করে। বগা-বুড়োর লাশ আসেনি। বিকৃত বীভৎস সে লাশ আনাও সম্ভব ছিল না। ঘটনাস্থলেই দাহ করে এসেছে ওরা। গুণ্ডাটার আর কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। যতটা জানা ও বোঝা গেল তা হচ্ছে—

সামনে পূবের টিলার পিছনের খাদে হাতীর দল আছে খবর ছিল। টিলার কোমরটাকে বেড় দিয়ে গিয়ে হাতীর দণ্ডীটা যেখানে মোড় নিয়ে খাদের ঢালুর দিকে নেমেছে সেই মুখটায় আগুনের কুণ্ডটা জ্বালাবার উদ্দেশ্য নিয়েই গড়ওয়ালারা চারজন এক লাইনে এগোচ্ছিল। হাতীর দলের একটা মাক্না গুণ্ডা হয়ত হাওয়ার টানে মানুষের গন্ধ পেয়েছিল। মোকাবিলা করার জন্য সে দণ্ডি ধরে উপরে উঠে এসে টিলার গায়ের একটা সংকীর্ণ বাঁকে ঘাঁটি নিয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল। নিজেকে নিঃশব্দ মনে করলেও পুরোপুরি সে নিঃশব্দ ছিল না। কারণ তার শুঁড়ের একস্থানে একটা

কাটা গর্ত ছিল যার ভিতর দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের হাওয়া বেরিয়ে একটা বেয়াড়া ফরর-ফরর শব্দ হোত।

চারজন ওরা এক লাইনে এগোচ্ছিল। সামনে খড়্গেশ্বর। তার পেছনে বগাবুড়ো—হাতে বন্দুক। তার পেছন পর পর অন্য দুজন। শেষজনের হাতেও বন্দুক। হাওয়ার গতি ছিল ওদের সহমুখী। ফলে হাতীর কাটা শুঁড়ের অস্বাভাবিক শব্দটা একটু দেরীতেই পৌঁছেছিল ওদের কানে। তাই বাঁকটা ঘুরতেই তারা একেবারে হাতীর মুখোমুখি এসে হাজির। হাতী তো আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। তেড়ে আসতেই চারজন ওরা পেছন ফিরেই ছুট।

এগুনোর সময় খড়্গেশ্বর ছিল সবার আগে। পেছন ফিরে ছুটতে গিয়ে সে পড়লো সবার পেছনে। ফলে সে প্রায় হাতীর নাগালের মধ্যেই এসে গেল। উপায়ান্তর না দেখে ঘাবড়ে গিয়ে খড়্গেশ্বর টিলার নীচের দিকে বেশ কিছুটা গড়িয়ে গিয়ে বাঁশ ঝাড়ে আটকে গেল। এবাব গুণ্ডাটাব সামনে পড়লো বগাবুড়া। বিহ্বল বুড়ো তার হাতেব বন্দুকের কথা তখন বিস্মৃত হয়ে দৌড়ে প্রাণ বাঁচাতে চাইল। কিন্তু পারলো না। গুণ্ডাটা ওকে শুঁড়ে জড়িয়ে মাটিতে মারলো এক আছাড় এবং পরমুহূর্তে সামনের এক পায়ে বুড়োর দেহটা চেপে রেখে দ্বিতীয পায়ের এক প্রচণ্ড লাথিতে মুণ্ডটা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে। এতেও গুণ্ডাটার নিষ্ঠুরতা চরিতার্থ হোল না। হতভাগ্যের মস্তকহীন লাসটাকে চার পায়ের তলায় দলাই-মলাই করে মাটির স্তূপের সঙ্গে মিশিয়ে দিল সে। খড়্গেশ্বর বাঁশ ঝাড়ে জড়িয়ে কিছুটা অনুমান করছিল ওপরে কি হচ্ছে। অন্য দুজন দূরে গাছের ওপর আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে বসে মাকনা হাতীর পৈশাচিক সেই গুণ্ডামি দেখে ওরা মূর্ছা যাবার উপক্রম। বগাবুড়োর দেহটাকে ধূলি কাঁকরের সঙ্গে রক্তমাখা এক তাল মাংসপিণ্ডে পরিণত করার পর গুণ্ডাটা ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করে পাহাড়ের খাদে নেমে গেল।

কিন্তু উদ্ধারকারী দল এসে বগাবুড়োর মাথাটাকে আর খুঁজেই পেল না। গুণ্ডাটা হয়ত সেটাকে শুঁড়ে জড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল বা দূরে কোথাও জঙ্গলে নিক্ষেপ করেছিল।

গারো হিলের অভিযানে বেরুনোর পর বুনোর দল তাদের গুণ্ডাটাকে পাঠিয়ে প্রথম প্রত্যক্ষ আঘাত হেনেছে মেলা-শিকারীদের ওপর। বগাবুড়োর মৃত্যুকাহিনীর বীভৎসতার বিবরণ শুনে লালজী মুষড়ে পড়লেন। এ কয়দিন শিকারীরা হাতীর দলের পিছনেই লেগে ছিল। দলের রক্ষক হিসেবে মোকাবিলার মতলবে গুণ্ডাটা এখন থেকে সেই শিকারীদেরই পিছনে সর্বক্ষণ লেগে না থাকে। যাই হোক সতর্ক প্রহরার মাধ্যমে বিনা ঘটনায় সে রাত কাটলো। তবুও জংলী গুণ্ডাটা যে প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছে তাতে শিকারীদের যে কতক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকতে দেবে সে প্রশ্ন সবার মনেই।

ভোরে ক্যাম্পের কয়েকজন গিয়েছিল দক্ষিণ টিলাটির দিকে প্রাতঃকৃত্য সারতে। কাটা শুঁড়ের ছিদ্রপথের বাতাসের শব্দ কানে আসতেই সন্ত্রস্ত তারা নজর করে দেখে ঢালু বেয়ে গুণ্ডাটা নামছে। ক্যাম্পে খবর পৌঁছুলো। ধুনির আগুন উসকে দিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে সবাই রুখে দাঁড়ালো। গুণ্ডাটা সোজা ক্যাম্পের দিকেই নেমে এল। আক্রমণের মতলব নিশ্চয়ই। কিন্তু না—আক্রমণ করলো না। কিছু দূর এগিয়ে এসে কি-না কি ভেবে ক্যাম্পকে বেড় দিয়ে গিয়ে ব্যাটা উত্তরের পাহাড়ে উঠলো।

ক্যাম্পের বন্দুকটা হাতে নিয়ে লালজী এতক্ষণ একদৃষ্টে গুণ্ডাটার হাবভাব লক্ষ্য করছিলেন। গুণ্ডার চোখের দৃষ্টি ও চলার ভঙ্গীতে তিনি প্রমাণ পেলেন মানুষ সম্বন্ধে তার সকালের এই উদাসীনতা উদ্দেশ্যমূলক। লালজীর একথা বিলক্ষণ জানা আছে যে বাঘ মানুষখেকো হলে যেমন অধিক চতুর ও কৌশলী হয়, হাতীও সেইরূপ গুণ্ডা হলে বেশী মতলববাজ হয়।

হালচালে প্রমাণ মেলে এই মাকনা গুণ্ডাটাই হচ্ছে বুনোর দলের

রক্ষক। স্বয়ং রক্ষকই যখন মূল ঘাঁটি ছেড়ে বেপথে অন্যদিকে এগুলো, তখন বোঝা যায় গোটা দলটাও তাদের স্থান ত্যাগ করে গিয়েছে। অনুসরণ করা দরকার। গুণ্ডাটা উত্তর পাহাড়ে অদৃশ্য হলে পর লালজী নির্দেশ দিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যাম্প গুটিয়ে নির্দিষ্ট দণ্ডি ধরে সামনে এগুতে। গুণ্ডা অন্যত্র সরে গেছে। এই হচ্ছে এগুনোর নিরাপদ সুযোগ। বাস্তব পরিস্থিতির পর্যালোচনায় লালজী হয়ত নির্ভুল ছিলেন। কিন্তু অরণ্যচারী মানুষের নির্ভুল হিসেবও যে কখনও কখনও ভেস্তে যায় নিষ্ঠুর নিয়তির কুটিল চক্রান্তে—রাজপুত্র লালজীর জীবনে সে অভিজ্ঞতা তখনও হয়নি।

প্রায় পাঁচ মাইল দূরে একটি টিলার মাথায় বাবাগিরি গ্রাম। জোর কদমে এগিয়ে গিয়ে এই গ্রামে খবর মিললো হাতীর দল কাছাকাছিই আছে। বাবাগিরির পরবর্তী গ্রামের নাম বাঁদরা। দূরত্ব প্রায় ছয় মাইল। বুনো হাতীর দলকে পেছনে ফেলে অতদূর এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া একনাগাড়ে দশ-এগারো মাইল পাহাড়ী পথ পাড়ি দেওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্যও বটে।

বিশ্রামের জন্য হাতীর দল সব সময় বেছে নেয় পাহাড়ের খাদের দিকটা। তাদের সেই অবস্থানস্থলের সমউচ্চতায় শিকারী দলের ঘাঁটি থাকা উচিত। তাতে হাতীদের চলাচল পথের ওপর নজর রেখে তাদেরকে অনুসরণের সুবিধা হয়। তাছাড়া ঘাঁটির নিকটে পানীয় জলের সুবিধা থাকাও দরকার। গ্রামবাসীরা জানালে—বাবাগিরি টিলার ঠিক পাদদেশে একটি পরিষ্কার জলের ঝর্ণা আছে। লালজীর নির্দেশে তখন গ্রামের নীচে উৎরাই ধরে একটি ঘাট পেরিয়ে এসে সেই ঝর্ণার পাড়েই ক্যাম্প বসানো হোল। ঝর্ণার পাড়টা খাড়া। পূর্ব-দক্ষিণে একটি জুম চাষের ক্ষেত। স্থানটা মন্দ নয়। ক্যাম্পের যাযাবরী গোছগাছ ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি শেষ হলে পর রান্নাবান্নার তোড়জোড় সুরু হোল। প্রতিটি তাঁবুর সামনে চলতি রেওয়াজ মত ধুনিও জ্বললো।

চায়ের পাট শেষ হয়েছে। লালজীর অনুমতি নিয়ে বড়-ফাঁদি, খড়গেশ্বর ও মেন্দলা—এই তিনজনে বুনো হাতীর দলের খবর নিতে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে নিল ওরা ক্যাম্পের বন্দুকটা ও গড়ওয়ালাদের একটা গাদা বন্দুক। সর্পিল বনপথ ধরে ওরা সামনের পাহাড়ী ঘাটের দিকে যাচ্ছে। ওদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে লালজী বসে আছেন। অরণ্য-আবাসে তাঁর ঐ একই ভাবের আয়েসী বসা। বড় চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছে ওঁকে। আজ কয়েকদিন ধরে ওঁর‌ও মনে হচ্ছে—কি যেন একটা মহা অমঙ্গল সব সময় ওঁকে গারো হিলের বনপথে অনুসরণ করে চলেছে। কোথায় এর শেষ, কি ভবিতব্য সামনে অপেক্ষা করছে কে জানে?

বড়-ফাঁদিরা ওদিকে টিলার বাঁকে অদৃশ্য হয়েছে। ওরা গেছে তিনজন। আগে খেয়াল ছিল না। তিনজন যাওয়া কি ঠিক হোল? ‘তিন’ সংখ্যাটি অশুভ। খুব একটা সংস্কারপন্থী না হলেও এই মুহূর্তে লালজীর মন কেন জানি খুঁত-খুঁত করে।

ঠিক এই সময় সামনের জঙ্গলের ভিতর দিক থেকে বন্দুকের আওয়াজ হোল। সঙ্গে হাতীর উন্মত্ত হুঙ্কার।

পর্যবেক্ষক দল টিলার ঘাট পেরিয়ে গিয়েই গুণ্ডাটার সামনে পড়েছে। দৌড়ে গিয়ে গাছে উঠেই ওরা গুলি করেছে। সেই শব্দে ক্ষেপে গিয়ে গুণ্ডাটা ডাক ছেড়ে ওদের চার্জ করলো। ওরা ততক্ষণে নিরাপদ উচ্চতায় উঠে গিয়েছে। কিন্তু এদিকে গুণ্ডার ডাক শুনে বুনো হাতীর দল জঙ্গল ছেড়ে পাশের ক্ষেতে এসে নামলো। পোষা হাতীগুলো ওদিকেই বাঁধা ছিল। একটু পরে দেখা গেল ক্যাম্প, মানুষ, নিজেদের পোষা হাতী বুনো হাতী সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

কাণ্ডকারখানা দেখে ক্যাম্পের অনেকেই ঘাবড়ে গেল। লালজীরও চিন্তা হোল এই অবস্থায় জংলী হাতীর গোটা দলটা ক্ষেপে গিয়ে যদি ক্যাম্প আক্রমণ করে বসে, তাহলে সবাইকেই

মরতে হবে। যা হোক শেষ পর্যন্ত আগুন-টাগুন জেলে অতিকষ্টে বুনোর দলকে তো কোন রকমে হটানো গেল।

কিন্তু বেলা বাড়ে—বড়-ফাঁদিরা ফেরে না। মহাচিন্তায় পড়লেন লালজী। একটু এগিয়ে গিয়ে হাঁক দেওয়া হোল। ওরা সাড়া দিয়ে জানালে গুণ্ডাটা এখনও ওদের গাছের উপরে আটকে রেখেছে। তলা থেকে সরছে না। ক্যাম্প থেকে কোনরূপ শব্দ করতে ওরা নিষেধ করলে। শব্দ শুনলে গুণ্ডা আরো ক্ষেপবে।

অসীম উদ্বেগের মধ্যে সারাটা দিন কাটলো। শেষ পর্যন্ত বিকেলের দিকে ওরা তিনজন ক্যাম্পে ফিরে এল। গুণ্ডাটা ইতিমধ্যে সরে গেছে।

সবাই বলে বড় বেয়াড়া গুণ্ডা। বড়-ফাঁদি নাকি তার জীবনে এমন শয়তান গুণ্ডা কখন দেখে নি। খুবই দুর্লক্ষণ। রাতের দিকে অবস্থা কি দাঁড়াবে কিছুই বলা যায় না। বড়-ফাঁদির পরামর্শ হচ্ছে নিজেদের পোষা হাতীগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হোক। বাঁধা অবস্থায় আক্রান্ত হলে ওরা আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

বড়-ফাঁদির কথায় লালজীও ঘাবড়ে গেলেন। তখনও হাতী সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা খুব বেশী নয়। মুখ্যতঃ বড়-ফাঁদির ভরসায় তাঁর গারো হিলের অভিযানে আসা। সেই বড়-ফাঁদি যখন এতটা হতাশ ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে তখন এই বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় কি? কোন বুদ্ধি আর লালজীর মাথায় আসে না। স্নায়ুশক্তি যেন তাঁর অসাড় হয়ে আসছে।

সন্ধ্যার আগেই ক্যাম্পের সবাই খেয়ে-দেয়ে নিল। পোষা চারটি হাতী—প্রতাপসিং, পবনপিয়ারী, নুরজাহান ও কুমার। সব কয়টি বিশ্বস্ত হাতী। এর মধ্যে শিক্ষিত ও সাহসী হাতী প্রতাপসিং লালজীর অতি প্রিয় নিজস্ব বাহন। লালজীর কথামত এই প্রতাপসিং-এর এক পায়ে লম্বা শিকল বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হোল। ছাড়া পেয়ে প্রতাপসিং স্থান ত্যাগ না করে অন্য সঙ্গীদের কাছে

গিয়ে খেতে লাগলো। সারা রাত ধরে ক্যাম্পের ওপর গুণ্ডার হামলা হলেও প্রতাপসিং কিন্তু লালজীর বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছিল। সে কখনও ক্যাম্প এলাকা ছেড়ে যায় নি।

নিজেদের পোষা চারটি হাতীর লোকদের তাঁবু চারটি পাশাপাশি চতুর্ভুজের আকারে বসানো। তারই মাঝে মাঝে বড় বড় ধুনি জ্বেলে বন্দুকে গুলী ভরে নিয়ে সবাই সতর্ক পাহারায় বসলো।

আসলে বন্দুকের চেয়ে আগুনের ওপরই সবার ভরসা এখন বেশী। ক্যাম্পের বন্দুকটির সঙ্গে কোন বুলেট আনা হয় নি। ছররা ও এল জি কার্টিজই শুধু এসেছে। এতে হাতীর গায়ে শুধু সুড়সুড়ি দেওয়াই চলে। গাদা বন্দুক একবার ফায়ার করলে দ্বিতীয়বার তাতে বারুদ গেদে গুলী ভরে তৈরী করতে সময় লাগে। আলোচ্য গুণ্ডাটার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বন্দুকের শব্দ তাকে আরো বেশী উত্তেজিত করে। কাজেই তাকে তাড়াবার প্রয়োজনে বন্দুকের চেয়ে আগুনই বেশী কার্যকরী হবে বলে মনে হয়। তবু মনের সাহস বাড়াবার জন্য বন্দুকও হাতে রইল।

লালজীর তাঁবুর পেছনে ঝোরার পাড়ে রান্নার জায়গা। ঝোরার খাড়া পাড় মানুষের বুক সমান উঁচু। নীচে হাত খানেক জল। স্রোত আছে।

সন্ধ্যা ঘুরে গেছে। লালজীর পাচক বসন্ত রান্নার জায়গায় খেতে বসেছে। চারিদিকে আবছা অন্ধকার। ঝোরাটা সামনে আড়াআড়িভাবে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে মোড় নিয়েছে। একটু পরে ঐ মোড়ের দিক থেকে ঝোরার জলে একটা ছপ ছপ শব্দ ভেসে এল। হাতীর জঙ্গল। বসন্ত তাই সজাগ হয়েই ছিল। শব্দটা কানে আসতেই সেদিকে সে চেয়ে দেখে একটা কালো বিশাল দেহ ধীরে ধীরে ঝোরার জল ভেঙ্গে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে। কি সর্বনাশ! ভয়ে বসন্তরতো ভাত খাওয়া

মাথায় উঠে গেল। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে সে তাঁবুতে খবর দিল। খবর শুনে ক্যাম্পে হুলস্থুল পড়ে গেল।

লালজী নির্দেশ দিলেন পাহারাদাররা যে যেখানে আছে সেখান থেকে যেন এক পাও না নড়ে। ক্যাম্পের বন্দুকটা বাগিয়ে নিয়ে তিনি সন্তর্পণে তাঁবুর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর পেছনে বসন্ত, ভবেন ও বড়-ফাঁদি।

রান্নার জায়গার ঠিক নীচে ঝোরার পাড়ের গায়ে একটা হাল্কা ছোট মুলি বাঁশের ঝোপ। গুণ্ডাটা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ঝোরার খাদে সেই বাঁশ ঝাড়ের নীচে পৌঁছে থামলো। শুঁড়, কান কিছুই নড়ছে না। পাথরের মত নিশ্চল নিস্তব্ধ সে। ঝোরার পাড়ের উপর দিয়ে গুণ্ডাটার বুক পিঠই শুধু দেখা যাচ্ছে—এত বড় উঁচু দৈত্যাকার চেহারা তাঁর।

বেশ কিছু সময় গেল। দুই পক্ষই নীরব। এখন তো নিশ্চিন্তই বোঝা যাচ্ছে যে মূর্তিমান শয়তান ঐ দুর্ধর্ষ জানোয়ারটা আক্রমণের মতলব নিয়েই এগিয়েছে। বগাবুড়োর প্রাণ নিয়েছে। আজ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বড়-ফাঁদিদের গাছে আটকে রেখেছিল। এখন এই অন্ধকারের আড়ালে আড়ালে অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড প্রাণঘাতী আঘাত হেনে গোটা ক্যাম্পটাকেই সে বিধ্বস্ত করে দিতে চাইছিল। হঠাৎ উপস্থিতি জানাজানি হয়ে যাওয়ায় থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে সে। মগজে তার অন্য দুর্বুদ্ধির ফন্দি ঘুরছে হয়ত।

ডেঁটেল যুবক লালজী বুঝছেন—আক্রমণ করলে বন্দুকে ঠেকানো যাবে না। গাদা বন্দুকে বারুদের চার্জ বাড়িয়ে দিয়ে হয়ত গুলী করা যেতে পারে। কিন্তু গুণ্ডার একরোখা আক্রমণ প্রতিহত করার উপযোগী বুলেট বানানোর মত পাকা লোহার টুকরো-টাকরা কিছুই নেই। গড়ওয়ালাদের সঙ্গে বন্দুকগুলো এনেছে ওরা শুধু ফাঁকা আওয়াজ করে দণ্ডি ধরে বুনো হাতী খেদিয়ে আনবার জন্য। মন মানে না—তাই লালজী দু-চারটা এল জি কার্টিজ নিয়ে ক্যাম্পের

বন্দুকটা বাগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন ক্যাম্পের পিছনে। কিন্তু প্রতিপক্ষ তখনও চুপচাপ।

এভাবে একটা মতলববাজ গুণ্ডাকে সামনে নিয়ে কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায়? ওকে খেদাতে না পারলে স্বস্তি নেই। দোনলা বন্দুক হাতে। দুই ব্যারেলে তার দুটো এল জি ভরে নিলেন লালজী। কিছুই হবে না এতে। তবু যা হোক কিছু একটা করা দরকার। অসহ্য হয়ে উঠেছে এই অস্বস্তিকর প্রতীক্ষা। গৌরীপুর থেকে সাহস দিয়ে যে তাঁকে এই দুর্গম জঙ্গলে টেনে এনেছিল সেই বড়-ফাঁদির মুখে এখন রা নেই। নিজের বুদ্ধিতে যা করণীয় তাই করতে হবে।

এল জি কার্টিজের দু-চারটি দানা হাতীর চোখে গুঁজে দিতে পারলে ওকে হয়ত কিছুটা কাবু করা যেতে পারে। ঝোরার সঙ্কীর্ণ খাদে ব্যাটা দাঁড়িয়ে আছে আড়াআড়িভাবে। ডানদিক থেকে এসেছিল। কাজেই বাঁ দিকেই তার মুখ। মুলি বাঁশের ঝোপে নিশানা আটকাচ্ছে। লালজী নিঃশব্দে দু-চার পা বাঁ দিকেই সরে গেলেন। আবছা অন্ধকারে দৈহিক আকৃতিটা বোঝা গেলেও চোখটা ঠিকমত নজরে আসে না। ক্যাম্পে টর্চ আছে। কিন্তু জানা আছে টর্চের আলোয় হাতী বেশী প্ররোচিত হয়। অগত্যা হাতীর পিঠের শিরদাঁড়ার উর্ধ্বরেখা বরাবর মাথার দিকে দৃষ্টি চালিয়ে বাঁ চোখের অবস্থানটা কোনরকমে আন্দাজ করা গেল এবং লালজী গুলীও করলেন সেই চোখ বরাবর। গুলীর শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হোল। কিন্তু কি আশ্চর্য—শব্দ বা আঘাতের কোন প্রতিক্রিয়াই হাতীর মধ্যে দেখা গেল না। যেমন নিশ্চল ও নিঃশব্দ ছিল সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল সে। গুণ্ডাটা কি তাহলে অশরীরী অপদেবতা? বনাঞ্চলের সংস্কারে তাও অসম্ভব নয়।

গোটা ক্যাম্পটা যেন আড়ষ্ট নির্জীব। পার্শ্বে অপেক্ষারত ভবেন ও বড়-ফাঁদি যেন আতঙ্কে দম বন্ধ করে আছে। শ্বাস-

প্রশ্বাসের শব্দটাও তাদের কানে আসে না। লালজীর মনোবলও নিঃশেষিতপ্রায়।

বন্দুকের দ্বিতীয় নলে গুলী ভরা। পিছু হটা নিরাপদ নয়। যতদূর সম্ভব স্থির নিরিখে লালজী দ্বিতীয় গুলী করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডাটা প্রচণ্ড রোষে ঘুরে দাঁড়িয়ে মুলি বাঁশ ভেঙ্গে নিয়ে মানুষের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলো। লালজীরা একটু পিছিয়ে গেলেন। কোন কোন বাঁশের গোটা কাণ্ডটা উপড়ে নিয়ে ব্যাটা তার গোড়াটা শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে বসন্তের রান্নার জায়গায় পেটাতে আরম্ভ করলো। রান্নার হাঁড়িকুড়ি বাসন-কোসন কিছু ভাঙ্গলো, লণ্ডভণ্ডও হোল। ঝোরার পাড় সোজা খাড়া বলে হাতীটা হয়ত চটকরে উপরে উঠে আসার সুবিধে পাচ্ছিল না। বলা যায় না—চোখটাও হয়ত গুলীতে জখম হয়েছিল। যাই হোক কিছু সময় এইভাবে যুদ্ধের প্রথম পাঁয়তারায় বাঁশ ঝাড়টাকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে এবং হয়ত বা মানুষগুলোর মনোবলের পরীক্ষা নিয়ে শয়তানটা ঘুরে আস্তে আস্তে জল ভেঙ্গে ঝোরার বাঁকের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু অবসর পেয়ে সবাই আবার ধুনির পাশে গিয়ে বসলো।

অসীম হতাশা ও ক্লান্তিতে লালজীর দেহ মন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। সঙ্গীরাও আতঙ্কে দিশাহারা। ধুনির পাশে পাশে তাদের চাপা গুঞ্জন কানে আসে।

লালজীর অনুমান করতে অসুবিধে হয় না পরিস্থিতির গুরুত্ব। গুণ্ডাটাকে বিশ্বাস নেই। সে নিশ্চয়ই আবার ফিরবে। পরবর্তী আক্রমণের কৌশল পাল্টাবার মতলবেই তার এই সাময়িক পশ্চাদপসরণ। সংস্কারান্ধ গড়ওয়ালারা চরম সন্ত্রাসে মুষড়ে পড়েছে।

গৌরীপুরের রাজপরিবার এই দলের অনেকেরই আজীবনের অন্নদাতা। তাই অসীম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবশতঃ তারা হয়ত এই জীবন-মরণ পরিস্থিতির মধ্যে লালজীকে একা ফেলে যেতে ইতস্ততঃ

করছে। বড়-ফাঁদিও যেন—'যা হবার হবে'—এই ধরনের হতাশা-জনিত উদাসী মনে ধুনির পাশে নীরবে বসে।

'আমার আপন আর্থিক স্বার্থ ও জীবনের নিরাপত্তার প্রয়োজনে আমার মুখাপেক্ষী এতগুলি নিষ্ঠাবান ও নিরাপরাধ ব্যক্তির জীবন বিপন্ন করা কোনরকমেই উচিত নয়। সমীহবশে এরা হয়ত এই মুহূর্তে নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করতে পারছে না। কিন্তু বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেও আমার পক্ষে আর চুপ করে বসে থাকা অন্যায় হবে। আমার উদাসীনতায় যদি কারো জীবনহানি ঘটে, সে পাপ আমাতেই বর্তাবে। পোষা হাতীগুলোর নিরাপত্তার চিন্তায় সন্ধ্যার দিকে বড়-ফাঁদি বলেছিল তাদেরকে মুক্ত করে দিতে। এখন এই রাত্রে পরিস্থিতি যখন সম্পূর্ণরূপেই আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে এবং সহযোগী সঙ্গীদের নিরাপত্তাব গ্যারান্টি যখন আমি নিজে আর দিতে পারছি না, তখন আমার উচিত হচ্ছে স্বীয় সাহস ও বুদ্ধিতে নিজেদের জীবন বাঁচাবার জন্য তাদেরকে অনুমতি দেওয়া।'

লালজী বিবেকের দংশন অনুভব করছেন। দেরী না করে সবাইকে ডেকে জানালেন তাঁর মনের কথা। পরামর্শ দিলেন জঙ্গলেব আড়ালে আড়ালে পাহাড়ের মাথায় বাবাগিরি গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিতে।

বলা মাত্র গড়ওয়ালাদেব খড়গেশ্বর বাদে অন্য ছয়জন রওনা দিল। ক্যাম্পের আরো কয়েকজন ওদের সঙ্গী হোল। এদিকে রয়ে গেল শুধু বড়-ফাঁদি, ভবেন, রামেশ্বব ম্যান্দলা ও কাননসিং।

লালজী ভবেনকে বললেন গ্রামে চলে যেতে।

'আমার জীবনটাই কি বেশী মূল্যবান? আপনাকে এই বিপদের মধ্যে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মৃত্যু যদি আসে, সবাই একসঙ্গে মরবো।'

এই বিপদের মধ্যেও ভবেনের কথায় লালজীর মন ভরে গেল।

চরম হতাশার মধ্যে ঐ কথাগুলো যেন তাঁর মনের মধ্যে একটু সান্ত্বনার প্রলেপ দিল।

কিন্তু সেই সান্ত্বনার আমেজ লালজীর অদৃষ্টে বেশী সময় সইল না। একটু পরেই গতকাল যেদিকে মানুষ মারা পড়েছিল সেই পাহাড়ী ঘাটের দিক থেকে গুণ্ডাটার আবার এগিয়ে আসার শব্দ পাওয়া গেল। সে হয়ত আসতে চাইছিল নিঃশব্দে। কিন্তু তার কাটা শুঁড়ের ছিদ্র-পথে বাতাস বেরুনর যে ফরর ফরর শব্দ হয় সে শব্দ সে চাপবে কি করে?

ধুনির আগুন উসকে দেওয়া হোল। এছাড়া প্রতিরোধের আর নতুন পদ্ধতি বা উপকরণ কিইবা আছে?

দণ্ডি বরাবর টিলার বাঁকটা ঘুরে এসেই দুর্ধর্ষ জংলীটা সোজাসুজি ক্যাম্পের দিকে চার্জ করলো। ঐদিকে পোষা মাদী হাতী নুরজাহান বাঁধা ছিল। জংলীটা ঠিক ঐখানে এসে থেমে গেল ও নুরজাহানের খাবারে ভাগ বসিয়ে তার সঙ্গে খেতে আরম্ভ করলো। কিন্তু তার সাহস বেড়েছে ও মেজাজ আরও তিরিক্ষে হয়েছে। প্রমাণ-স্বরূপ দেখা গেল ক্যাম্পের দিক থেকে মানুষের আওয়াজ কানে গেলেই সে তেড়ে যাচ্ছে। ধুনির আগুনকেও পরোয়া করছে না।

গুণ্ডা তেড়ে এলে ক্যাম্পের লোকেরা তড়িঘড়ি পিছু হটে গিয়ে ঝোরার জলে নামে। তা দেখে গুণ্ডা আবার ফিরে যায় নুরজাহানের কাছে। ক্যাম্পের লোকেরা তখন জল ছেড়ে উঠে আসে ধুনির পাশে। এইভাবে তাড়াহুড়ো চললো কিছু সময় ধরে। ক্যাম্পের দিকে নড়াচড়া, কথা বলা, টর্চের আলো ফেলা কিছুই করার উপায় নেই। সব কিছুতেই গুণ্ডা খেয়ে আসে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তার মধ্যে বারবার হাড়-কাঁপানো বরফ জলে গিয়ে নামতে হচ্ছে। অসহ্য।

লালজীর দেহ অবসন্ন। মন ভারাক্রান্ত। একটু আগে সঙ্গীদের প্রাণ বাঁচাবার উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি। এখন নিজেরই

চরম হতাশাজনিত মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়েছে। কালাপাহাড়ের মত দুর্দান্ত গুণ্ডাটা অদূরে দাঁড়িয়ে। ক্যাম্পে বসে লড়ে ঐ মূর্তিমান শয়তানের হাত থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই। হায় রে, এই সময় রাইফেলটা হাতের ধারে নেই—যার একটি মাত্র বুলেটের আঘাতে ঐ জংলী পশুটাকে ধরাশায়ী করা যেত। অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন লালজী। যমদূতকে সামনে নিয়ে ধুনির আগুন কোলের ধারে রেখে অনেক কথা মনে আসে তাঁর।

'এই সেই কিংবদন্তীর অরণ্য রাজ্য গারো হিল। কত না রহস্য, কতনা রোমাঞ্চ ছড়িয়ে আছে এর দুর্গমতার গভীরে কে জানে? রোমাঞ্চের পিয়াসী আমি। কিন্তু এই অসহনীয় ও অকল্পনীয় প্রাণঘাতী প্রহেলিকার প্রত্যাশী নিশ্চয়ই নই। আমার পিতৃদেবের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থেকে আমি অরণ্যকে চিনেছি, জেনেছি, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতেও শিখেছি। কিন্তু মানুষের চেয়ে সহস্রগুণ দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান একটি অরণ্যদানবের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে দাঁড়াবার আমার হাতিয়ার তো আমি প্রথম দিনই ছেড়ে এসেছি আমার মূল ক্যাম্পে।

হতভাগ্য গড়ওয়ালা বগাবুড়োর বীভৎস মৃত্যুর পটভূমিকায় লালজীর চোখের সামনে চলচ্চিত্রের মত একে একে ভেসে ওঠে তাঁর সাধের গৌরীপুর, পরিবার, পরিজন, প্রতিবেশী, রাজবাড়ীর পাত্র, মিত্র, সিপাই সান্ত্রী সবার কথা। তাদের মধ্যে আবার তাঁকে ফিরে যেতেই হবে। এই জংলী গুণ্ডার হাতে অসহায় মৃত্যু তাঁর কাম্য নয়। এ মৃত্যু অর্থহীন। সুখ, শান্তি ও স্বচ্ছলতার মধ্যে দীর্ঘায়ুর প্রত্যাশী তিনি। কিন্তু অখ্যাত অজ্ঞাত এক বনভূমির নিভৃত অংশে অপ্রতিরোধ্য অপমৃত্যুতে বুঝি তাঁর সেই আশা ও প্রত্যাশার পরিসমাপ্তি ঘটবে আজ।

লালজীকে ১৯৪৫ সালের সেই অশুভ রাতের বিভীষিকার সামনে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল—জীবনে

আর কখনও এই বিপজ্জনক কাজে নামবেন না। নেমেছিলেন কিনা তার পরবর্তী ইতিহাস আমি পূর্বেই জানিয়েছি। এও জানিয়েছি যে মানসিক শক্তি ও সাহস হারিয়ে সেদিনের সেই রাতের অন্ধকারে লালজী হয়েছিলেন সম্পুর্ণরূপেই বিহ্বল ও বিভ্রান্ত।

লালজী উপস্থিত সবাইকে জানালেন—আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। গুণ্ডাটার চোখে ধুলো দিয়ে যে কোন কৌশলে এই স্থান ত্যাগ করতে হবে। নইলে মৃত্যু অনিবার্য। তিনি বড়-ফাঁদিকেও পালাবার কথা চিন্তা করতে বললেন।

'এই পোষা হাতীগুলো আমার দানাপানির ব্যবস্থা করে। এদের ফেলে আমি যাবো না। আপনি আপাতত ভবেনকে নিয়ে চলে যান'—বড়-ফাঁদির নৈতিক দায়িত্বজ্ঞান ও দরদী মনের পরিচয় পেয়ে লালজী মুগ্ধ। অস্বীকার করে লাভ নেই কিছুটা সঙ্কুচিতও বটে। কিন্তু উপায় নেই।

আমার শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছে। আর পারছি না। আমাকে যেতেই হবে। জলে ভেজার পর থেকে সর্বশরীর কাঁপছে। এর পর হয়ত আমি চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়বো। কিন্তু যাবোই বা কি করে? সে চেষ্টা করলে জংলীটা তেড়ে আসবে। বন্দুকের গুলি শেষ হয়ে গেছে! মাত্র চার-পাঁচটি ছররা আছে। অদৃষ্টের ফেরে আজ আমরা সদলবলে একটি ক্ষিপ্ত ও হিংস্র বন্যপশুর হাতে বন্দী।

ওঁর কিছুটা গলার স্বর হয়ত গুণ্ডাটার কানে গিয়েছিল। কাল-বৈশাখীর দাপটে তাই সে তেড়ে এল লোকগুলোর দিকে। সবাই আবার দৌড়ে গিয়ে ঝোরার জলে নামলো। লালজী এবার বন্দুক ও বড় টর্চটা ছোঁ মেরে নিয়ে দৌড়েছিলেন। ঝোরার জলে দাঁড়িয়ে বড়-ফাঁদি পরামর্শ দিলে—এবার আপনারা দুজন আর ক্যাম্পে ফিরবেন না! এখান থেকেই পালিয়ে যান।

গুণ্ডা ফিরে গেছে ততক্ষণে নুরজাহানের কাছে। বড়-ফাঁদি, খড়গেশ্বর, রামেশ্বর, ম্যান্দলা ও কাননসিং ধীরে ধীরে আবার জল

ছেড়ে ধুনির কাছে গিয়ে বসলো। ছাড়াছাড়ি হবার আগে লালজী গুণ্ডাকে বিভ্রান্ত করার ফন্দি বাৎলে দিয়েছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত মত ভবেনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঝোরার জল ভেঙ্গে এগুলেন। ক্যাম্পে পড়ে রইল তাঁর টাকাকড়ি সব কিছুই।

লালজীরা বেশ কিছুটা এগিয়েছেন। ঝোরার জলে শব্দ হচ্ছে। গুণ্ডাটা তার কুলোর মত কান খাড়া করে সে শব্দ শুনলো এবং পরক্ষণেই তেড়ে গিয়ে নামলো ঝোরার খাদে। ঠিক সেই সময় পূর্ব-পরামর্শমতো ক্যাম্প থেকে বড়-ফাঁদি চেঁচিয়ে উঠলো। শত্রু এদিকে মনে করে গুণ্ডা তেড়ে ফিরে এলো আবার ক্যাম্পের দিকে। লালজীরা তখন ওদিকে চীৎকার দিয়ে জল ভেঙ্গে ছুটলেন। আর একদল শত্রু পালালো মনে করে গুণ্ডা আবার হন্তদন্ত হয়ে নামলো গিয়ে ঝোরার খাদে। বড়-ফাঁদিরা তৈরীই ছিল! ততোধিক চীৎকারে প্ররোচিত করে আবার তারা পাগলাটাকে ফিরিয়ে আনলো ক্যাম্পের দিকে । ফন্দিতে কাজ হয়েছে। জংলীটা চিৎকার ও পাল্টা চীৎকারে বিভ্রান্ত হয়ে এদিকওদিক ছোটাছুটি করছে।

যাই হোক—গুণ্ডাটার দ্বিমুখী দৌড়ঝাঁপের টানাপোড়েনের সুযোগে লালজীরা ঝোরা বরাবর এগিয়ে গিয়ে বাবাগিরি গ্রামের পথ পেয়ে গেলেন। গুণ্ডাকে বিশ্বাস নেই। তাই তারা প্রাণ-পণে ছুটলেন। দম বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও ছুটছেন। উপায় নেই।

মাঝপথে একটু দাঁড়িয়েছেন ওঁরা দম নেবার জন্যে। সামনে শুকনো পাতায় শব্দ ওঠে। হাতী নাকি? বলা যায় না। অন্ধকারে কিছু বোঝাও যায় না। লালজী ভবেনকে বললেন—সামনে টর্চের আলো ফেলতে। একটা প্রকাণ্ড চিতাবাঘ সামনে পথের মাঝখানে বসে। আলো পড়ায় চোখদুটো তার জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলছে। জ্বলুক। গুণ্ডার ভয়ে তখন পেছনোর উপায় নেই। বন্দুকের নলে কমজোরি ছররা ভরা! তা হোক। তাই

বাগিয়েই লালজী এগিয়ে গেলেন। চিতাবাঘ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তর্জন গর্জনে একটু ভয় দেখাবার ভান করে এক লাফে জঙ্গলে পড়ে লালজীকে পথ ছেড়ে দিলে।

বাবাগিরি টিলার চড়াই ভেঙ্গে আরো কিছুটা পথ উঠতেই দম ফুরিয়ে গেল। একটু বিশ্রাম একান্তই দরকার! একটা ঝাকড়া গাছের গুঁড়িতে দুজনে বসলেন। কিছু সময় কেটেছে। বুকের ধড়ফড়ানি ও হাঁইফাঁই অবস্থাটা সবে একটু কমেছে। এমন সময় আবার ধুপধাপ শব্দ। এবার নীচের দিক থেকে। হাতী না হয়ে যায় না। এত কাণ্ডের পর হাতী হলেই বা উপায় কি আছে? দেখাই যাক মামলা আবার গড়ায় কতদূর?

হঠাৎ ধপাস করে কিছু একটা পতনের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে 'হায় রাম' বলে একটা কাতর ধ্বনি। লালজী চমকে উঠলেন।

'কে রে তুই মানুষটা'?

'আমি খড়গেশ্বর কর্তা।

'কি খবর রে? লালজী হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন। ভয়— হয়ত বা ক্যাম্পের অন্যান্যদের কোন বিপদ ঘটেছে।

না বিপদ নয়। লালজী গায়ের চাদরটা ফেলে এসেছিলেন। শীতে কষ্ট হবে বলে বড়-ফাঁদি সেটা পাঠিয়ে দিয়েছে।

ধন্য এই প্রভুভক্ত বৃদ্ধটি। কৃতজ্ঞতাবোধে লালজীর চোখে জল এসে গেল।

তিনজনে তখন পা চালালেন গ্রামের দিকে। বাবাগিরি টিলার শীর্ষদেশে প্রায় পৌঁছে গেছেন ওঁরা। উর্ধ্বাকাশে তারার মেলা। তারই আবছা আলোয় নজরে পড়লো গ্রামের মুখেই একটা প্রকাণ্ড হাতী দাঁড়িয়ে। কান ও দাঁত দেখা যাচ্ছে। তাহলে মাকনা গুণ্ডাটা নয়। দাঁতাল। নড়া-চড়া নেই। একভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আক্রমণের মতলব মনে হচ্ছে। টর্চ জ্বালাতে সাহস হয় না। তেড়ে আসবে। এ আবার কি জ্বালা হোল?

কতক্ষণ আটকা থাকতে হবে? যা থাকে কপালে বলে টর্চ জ্বালা হোল। মুহূর্তে হাতী উবে গেল। দেখা গেল গ্রামের লোকেরা অপদেবতার পূজো দেবার জন্য দুটো মুলি বাঁশ চেঁছে সাদা করে পাশাপাশি হেলান দিয়ে রেখেছে ও তারই দুপাশে দুটো কুলো টাঙ্গানো আছে। আবছা অন্ধকারে লালজীর বিহ্বল দৃষ্টিতে দু-জোড়া বাঁশ ও কুলো হয়েছে হাতীর দাঁত ও কান। হায়রে ভীত মন!

বাকী রাতটুকু গ্রামেই কাটলো। সকালে খবর এল বুনো হাতীর দল তাদের রক্ষক গুণ্ডাকে নিয়ে মাঝরাতেই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। ক্যাম্পের সবাই নিরাপদে আছে।

খবরটা যাচাই করে নিয়ে লালজী ক্যাম্পে ফিরলেন। ফেরা মাত্রই বড়-ফাঁদি এক কাপ গরম চা দিয়ে কর্তাকে আপ্যায়ন করলো। দুপুর নাগাদ ক্যাম্প গুটিয়ে পাঁচ মাইল দূরে বাদরা গ্রামে পৌঁছে সেখান থেকে বড় রাস্তা ধরে ডালু গ্রামের মূল ক্যাম্পে। পেছনে পড়ে রইল তখন সেই বুনো হাতীর দল ও তাদের কুখ্যাত রক্ষক সেই গুণ্ডাটার বিভীষিকার রাজত্ব। সেই বিভীষিকার স্মৃতি আজও লালজীর এই পরিপক্ক বয়সে দুঃস্বপ্নের মত মাঝে মাঝে তাঁর মনকে আনমনা করে তোলে।

॥ দুই ॥



পরিচিতি

প্রাচীন বংশ ইতিহাস

মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল মুসলমান রাজত্বের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। সে যুগে নবাব বাদশার প্রতিপত্তির প্রাদুর্ভাব থাকলেও হিন্দু শিক্ষা, শাস্ত্র ও সংস্কৃতি চর্চার খুব বেশী বাধা ছিলনা।

গুরুগৃহে গমনের সুপ্রাচীন বাধ্যতামূলক রীতির যুগ পেছনে ফেলে এসে নিষ্ঠাবান পণ্ডিতের ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে থেকে বিদ্যার্জন ও শাস্ত্রচর্চার ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল বহুদিন আগেই।

আবহমান কাল থেকে বারাণসী ছিল সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। তাই বিদ্যানুরাগী হিন্দু রাজা, মহারাজা, জমিদার, ভূস্বামী পরিবারের পুত্রদের সমাগম বারাণসীতেই ছিল বেশী। পণ্ডিত পরিচালিত সেখানকার আবাসিক টোলগুলি তাই সবসময় থাকতো জমজমাট।

কবীন্দ্র, নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ ছিলেন একই টোলের তিন সহপাঠী। কবীন্দ্র ছিলেন বিহারের ইউ পি সীমান্ত সংলগ্ন ছাপরা জেলার জমিদার বংশের সন্তান। নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ দুই ভাই ছিলেন কুচবিহার রাংজবংশের পূর্বপুরুষদের সন্তান। ধনৈশ্বর্য ও প্রতিপত্তির পার্থক্য থাকলেও বারাণসীর টোল জীবনে উক্ত দুই বংশের তিন সহপাঠীর মধ্যে ছিল গভীর বন্ধুত্ব।

কবীন্দ্র বারাণসীতে কাব্য পড়তেন। নরনারায়ণ পড়তেন রাজনীতি ও তাঁর ছোটভাই শুক্লধ্বজ রণনীতি। দুই পরিবারের

সন্তানদের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল যে কবীন্দ্রের সঙ্গে কুচবিহার ভ্রাতৃদ্বয়ের ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদ অত্যন্ত বেদনাদায়ক হবে মনে করে অধ্যয়ন শেষে স্বীয় রাজ্যে প্রবর্তনের সময় নরনারায়ণ সহপাঠী কবীন্দ্রকে তাঁর পরিবারসহ কুচবিহারে নিয়ে এসে তৎকালীন ঘুল্লা পরগনার জমিদারী অর্পণ করেন। সর্বক্ষণের জন্য বন্ধুর সংস্পর্শে থাকবার মানসে তিনি কবীন্দ্রকে রাজপরিষদেরও সভ্য নিযুক্ত করেন। পদমর্যাদার ভিত্তিতে কবীন্দ্রের পদবী হয় 'পাত্র'। তখন মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল।

বারাণসীর টোলে রণনীতি বিষয়ক জ্ঞানার্জন শেষ করে এসে শুক্লধ্বজ কুচবিহার-রাজ অগ্রজ নরনারায়ণ কর্তৃক রাজ-পরিবারের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। স্বীয় সাহস, দক্ষতা ও রণচাতুর্য প্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে শুক্লধ্বজ পরবর্তীকালে 'চিলারায়' এই ডাকনামেও পরিচিত হন।

শুক্লধ্বজের একটি দুর্দান্ত ঝটিকাবাহিনী ছিল। তাঁর 'চিলারায়' ডাকনামের পটভূমিকা সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই যে—চিল যেরূপ দ্রুতগতিতে ছোঁ মেরে কিছু অধিকার করে, প্রধান সেনাপতিরূপে চিলারায় সেইরূপ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঝটিকা আক্রমণে বাংলার বগুড়া জেলার করতোয়া নদী থেকে আসামের বর্তমান দরং জেলার ডিকরাই নদী পর্যন্ত সমগ্র পূর্বাঞ্চলে অস্ত্রবলে কোচ রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার করেন।

উপরোক্ত কৃতিত্বপূর্ণ সামরিক সাফল্যের স্বীকৃতি-স্বরূপ কুচবিহার রাজ নরনারায়ণ ছোটভাই চিলারায়কে বিজনী রাজ্য (পূবে হাজো, পশ্চিমে গঙ্গাধর নদী, উত্তরে ভুটান, দক্ষিণে গারো পাহাড়) প্রদান করেন। চিলারায় তখন কবীন্দ্র পাত্রের পরিবারকে কুচবিহার থেকে আসামে নিয়ে এসে তাঁদেরকে জামিরা পরগণা অর্পণ করেন।

পরবর্তীকালে সৈন্যাধ্যক্ষ মীরজুমলার নেতৃত্বে মোগল বাহিনী

আসাম আক্রমণ করে। মীরজুমলা বর্তমান গোয়ালপাড়া জেলার রাঙ্গামাটি হয়ে গৌহাটি সংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমপারে সরাইঘাট পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু স্বীয় অসুস্থতা ও অন্যান্য প্রতিকূলতা হেতু বাধ্য হয়ে পরে তাঁকে পূর্ব অধিকৃত রাঙ্গামাটি পর্যন্ত পশ্চদাপসরণ করতে হয়।

রাঙ্গামাটিতে পৌঁছে মোগল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক স্থায়িত্বের প্রয়োজনে মীরজুমলা কবীন্দ্র পাত্রের পরিবারের প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা বিবেচনা করে তাঁদেরকে বারোহাজারী মনসবদার নিযুক্ত করেন এবং গোলে আলমগঞ্জ ও নবাবাবাদ ফতুরী নামক দুইটি পরগণা প্রদান করেন। তাছাড়া মোগল সাম্রাজ্যের পূর্বসীমানা রক্ষার্থে তাঁদের হেপাজতে দুই হাজার অশ্বারোহী ও দশ হাজার পদাতিক সহ মোট বারোহাজার সৈন্য মোতায়েন রাখেন।

মোগল আক্রমণের মুখে ঐ সময় বিজনী রাজ পলাতক ছিলেন। কবীন্দ্র পরিবারের মধ্যস্থতায় বিজনীরাজকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং মীরজুমলা তাঁকে বিজনী রাজ্যের উপরোক্ত দুটি পরগণা ছাড়া বাকি অংশের জমিদার নিযুক্ত করেন।

মীরজুমলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাঙ্গামাটিতে মোগলদের থানা স্থাপিত হয়। কবীন্দ্র পাত্র ঐ থানার অধীনস্থ অঞ্চলের কানুনগো নিযুক্ত হন ও যৌতুক হিসাবে কালুমালু পাড়া এলাকার (গারো পাহাড়ের পাদদেশ বরাবর ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীর) মালিকানা পান। ঐ মালিকানা বাবদ এইরূপে খাজনা ধার্য হয় যে মোগল সম্রাটকে বাৎসরিক চার 'হাল'—অর্থাৎ ৮টি হাতী দিতে হবে।

গৌরীপুরের চার মাইল দূরে রমনার মাঠ নামে একটি এলাকা আছে (ঢাকার রমনার মাঠ নয়)। কথিত আছে মীরজুমলা নাকি আসাম জয় করতে এসে অসুস্থ হয়ে ঢাকায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁরই তৈরী একটি মসজিদ ও ইদগহারের ভগ্নাবশেষ আসামের উপরোক্ত রমনার মাঠের নিকটবর্তী একটি মালভূমিতে ছিল। হাতী,

গণ্ডার প্রভৃতি বন্যজন্তু অধ্যুষিত উক্ত মালভূমির আয়তন ছিল আট দশ বর্গমাইল।

পূর্বোক্ত কালুমালু পাড়ার সম্পত্তির জন্য কবীন্দ্র পাত্র কর্তৃক মোগল দরবারে প্রদেয় আট-হাতী খাজনার রেওয়াজ ভারতে বৈদেশিক শাসন অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্যের সুরু পর্যন্ত চালু ছিল। তৎপরবর্তীকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসন দপ্তর কবীন্দ্র পরিবারের সঙ্গে সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত মোগল দরবার প্রবর্তিত অন্যান্য সর্তাদি খারিজ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ঐ পরিবারকে জমিদার হিসাবে উল্লেখ করেন। কিন্তু খাজনার নিয়ম অপরিবর্তিত রেখে বাৎসরিক ঐ ৮টি হাতীই গ্রহণ করতে থাকেন। খাজনা হিসাবে হাতী গ্রহণ করার একটা কারণও ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামরিক বিভাগের একটি হস্তি-বাহিনী (এলিফ্যাণ্ট ব্রিগেড) ছিল। যতদিন এই বাহিনীর অস্তিত্ব ছিল ততদিন হাতীর খাজনাই প্রচলিত ছিল। কোম্পানির হস্তি বাহিনী উঠে যাবার পর আট হাতীর মূল্য বাবদ পাঁচ হাজার টাকা ধার্য হয়, এবং জমিদারী প্রথার অবলুপ্তি পর্যন্ত কবীন্দ্র পরিবারের ঐ পাঁচ হাজার টাকার খাজনাই চালু ছিল।

বড়ুয়া পদবীর উৎপত্তি

ব্রহ্মের শানজাতি একসময় আসাম আক্রমণ করে 'আহম' রাজ্যের পত্তন করে। পরে কুচবিহার রাজ তথা চিলা রায়ের পরবর্তী বংশধরদের সঙ্গে শান বাহিনীর যুদ্ধ হয়, এবং দীর্ঘদিন হারজিতের পর উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। 'আহম' রাজ্যের যাঁরা মন্ত্রী ছিলেন তাঁদেরকে বড়ুয়া পদবী দেওয়া হয়। কুচবিহার রাজ্যের সঙ্গে আহম রাজ্যের সন্ধির পর কুচবিহার রাজ-পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত 'পাত্র' উপাধিধারী যাঁরা এতদঞ্চলে ছিলেন তাঁদের বংশধররাও স্বেচ্ছায় 'বড়ুয়া' পদবী গ্রহণ করেন।

গৌরীপুরের আদি ইতিহাস

অধুনা গোয়ালপাড়া জেলার রাঙ্গামাটি থানা এলাকা ছিল পাহাড়-সঙ্কুল। এই এলাকার পশ্চিমাংশ ছিল বহুপ্রকারের পশুপক্ষী অধ্যুষিত জলাভূমি। রাঙ্গামাটির বড়ুয়া পরিবারের লোকেরা এই অঞ্চলে শিকার করে বেড়াতেন। একদিন তাঁদের একজন এই জলাভূমিতে একটি ব্যাঙকে সাপ খেতে দেখেন। সংস্কার অনুযায়ী এটা নাকি খুবই শুভ-লক্ষণ। এখানে বসবাস করলে সে পরিবারের ভবিষ্যৎ নাকি কল্যাণকর হয়।

রাঙ্গামাটির পাহাড়ী এলাকার বাড়ীঘর ছিল কাঠের পাটাতন দেওয়া খড়ের চালের। তাই হামেশা বাড়ীঘর আগুনে পুড়ে যেত। সে কারণে দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিলনা। শুধু ঘট প্রতিষ্ঠা করেই পূজার্চনার প্রচলন ছিল।

কথিত আছে—মোগল আমলে এতদঞ্চলের শাসনকর্তা হোসেন শাহের নির্দেশে কবীন্দ্র পাত্র আদি সংস্কৃত থেকে সর্বপ্রথম বাংলায় মহাভারত রচনা করেন। এই রচনা কাশীরাম দাস লিখিত মহাভারতের বহু পূর্বের ঘটনা।

ভূর্জপত্রে লিখিত সেই আদি পাণ্ডুলিপিটি গৌরীপুরের কর্তা-বাহাদুর প্রতাপ চন্দ্রের পিতামহের আমলে নাকি আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। সৌভাগ্যবশতঃ বড়ুয়া বাড়ীর তৎকালীন আত্মীয়দের কেহ কেহ সেই আদি বাংলা রচনার অনুলিপি আগে থেকে রেখেছিলেন বলে সেই রচনার অস্তিত্ব লোপ পায়নি।

বড়ুয়া পরিবারের ধর্মপ্রাণ কর্তারা প্রতিদিন ভোরে পায়ে হেঁটে ব্রহ্মপুত্র দর্শনে গিয়ে সূর্যপ্রণাম করতেন। এই বংশের এক কর্তা নাকি ব্রহ্মপুত্র দর্শনের জন্যে একটি উঁচু পাকা ইমারত তৈরী করেন।

কিম্বদন্তি এই যে—উপরোক্ত পাকা ইমারত তৈরীর কারণে ব্রহ্মপুত্র নাকি রুষ্ট হন।

'ওদের এমনই অহঙ্কার যে আমাকে দর্শন করবার জন্য ওরা পায়ে হেঁটে আমার তীরে আসার কষ্টটুকুও সহ্য করতে চায়না। পাকা ইমারতের মাথায় উঠে আমাকে দর্শনের স্পর্ধা দেখাচ্ছে। এত তাচ্ছিল্য আমাকে'? এইটাই নাকি ছিল ব্রহ্মপুত্রের একমাত্র রোষের কারণ।

তাই বড়ুয়াদের অহঙ্কারের উপযুক্ত শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে অসন্তুষ্ট ব্রহ্মপুত্রের উদ্দাম গতিপথের পরিবর্তন ঘটে এবং তার জলধারার ইচ্ছাকৃত প্রচণ্ড প্লাবনের মুখে বড়ুয়াবাড়ীর সুউচ্চ ইমারত স্রোতগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এই ভাঙ্গনের ফলে ব্রহ্মপুত্রের বিপরীত কূলে যে চর জেগে উঠে তার নাম হয় 'দালানীর আলগা'।

এই ঘটনার পরবর্তীকালের এক কৌতূহলজনক কিম্বদন্তী এই যে—বড়ুয়াবাড়ীর এক কর্তা একদিন পদব্রজে ব্রহ্মপুত্র দর্শনে গিয়ে সূর্য প্রণাম করবার সময়ে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে একসঙ্গে দুইটি সূর্য উদয় হচ্ছে, এবং একটি অপরূপ সুন্দরী ষোড়শী নারী ব্রহ্মপুত্রের জলভরা বুকের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে আসছেন।

এপারে পাহাড়ের গায়ে বাঘ-মারা নামে একটি বস্তি ছিল যার নীচে একটি গুহায় বাঘ বাস করতো। ষোড়শী নারীটি ঐ গুহা পর্যন্ত এসে একটি বাঘের পিঠে আরোহণ করলেন। ব্রহ্মপুত্র-দর্শনার্থী কর্তাটি আড়াল থেকে মুগ্ধ বিস্ময়ে এই দৃশ্যটি দেখেন এবং অসীম কৌতূহলবশতঃ নারীর পরিচয় জানবার জন্য ভক্তিভরে তাঁর যাত্রাপথ আগলে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে থাকেন।

একটু পরেই ব্যাঘ্রারূঢ় নারী সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং ওঁকে পথ ছেড়ে দিতে বলেন। উনি অসম্মত হন ও নারীর পরিচয় জানতে চান। নারীটি তখন কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে লোকটির দেহে পর পর সাতবার পদাঘাত করে তাঁর ধৈর্য পরীক্ষা করেন।

কিন্তু পদাঘাত খেয়েও পরিচয় না পেলে পথ ছাড়বেন না, ভক্তিভরে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা তিনি পুনরায় প্রকাশ করলেন। নারীটি তখন সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর চোখের সামনে দশভূজা মূর্তি ধারন করলেন এবং অভয় দিয়ে বললেন যে সাত পুরুষ পর্যন্ত তিনি বড়ুয়া পরিবারে অধিষ্ঠিত থাকবেন। নিষ্ঠা সহকারে পূজা পেলে তারপরও থাকবেন নইলে অন্তর্হিত হবেন।

এই কাহিনী লালজীর মুখে শোনা। লালজীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতা নীহার বড়ুয়ার মুখে শুনেছি অন্য এক কাহিনী।

তখনকার দিনে পুরুষদের মাঠে ময়দানে প্রাতঃকৃত্য সারতে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। বড়ুয়াবাড়ীর এক কর্তা অতি প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্যের উদ্দেশ্যে মাঠে গিয়ে দেখেন অত্যুজ্বল একটি' গোলক দিগন্ত থেকে মর্ত্তের দিকে এগিয়ে আসছে ও ক্রমেই আয়তনে বাড়ছে। অবশেষে সেই গোলকের মধ্য থেকে একটি দেবীমূর্তির আবির্ভাব ঘটলো। বিস্ময়াভিভূত কর্তাটি তখন তাঁর পথ রোধ করে শুয়ে পড়লেন এবং দেবীর পরিচয় জানতে চাইলেন। দেবী কর্তাকে পর পর সাতবার পদাঘাত করলেন। অষ্টম পদাঘাতে কর্তা যন্ত্রনায় কাতরে উঠলেন। দেবী তখন তুষ্ট হয়ে সহানুভূতির অভিব্যক্তিতে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত বড়ুয়া বাড়ীতে অধিষ্ঠিত থাকবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভক্তির অভাব ঘটলে পরে অন্তর্হিত হবেন। অভিভূত কর্তা ঐ সময় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান হলে দেখেন তাঁর কোলের ধারে একটি মহামায়ার ক্ষুদ্র স্বর্ণমূর্তি পড়ে আছে।

সেইদিন থেকে বড়ুয়া বাড়ীতে মহামায়ার প্রতিষ্ঠা হয় ও নিয়মিত পূজা হয়। ঐ সময় থেকে পরবর্তী পঞ্চম পুরুষ পর্যন্ত বড়ুয়া পরিবার রাঙ্গামাটিতে বসবাস করেছিলেন। তারপর পশ্চিমদিকে সাত আট মাইল দূরে জলাভূমির যে অঞ্চলে তাঁদের জনৈক পূর্বপুরুষ ব্যাঙের সাপ খাওয়া দেখেছিলেন সেই অঞ্চলে সরে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং ঐ স্থানের নামকরণ করেন 'গৌরীপুর'।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে সমসাময়িক কালের কোন তথ্যসিদ্ধ লিখিত বিবরণ না থাকায় লোকমুখে প্রচারিত ভিন্ন কাহিনীর অস্তিত্ব থাকাও অসম্ভব নয়।

মহামায়ার সময় থেকে লালজীরাই হচ্ছেন অষ্টম পুরুষ। অতি কৌতূহলজনক ও বিস্ময়কর ঘটনা এই যে ঠিক এই অষ্টম পুরুষের সময়েই গত ১৯৭১ সালে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে পূজা মণ্ডপ থেকে সেই মহামায়ার স্বর্ণ মূর্তি অন্তর্হিত হয়েছে।

গৌরীপুর রাজপরিবারের বর্তমান বংশধর অর্থাৎ স্বর্গীয় রাজা প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়ার পুত্র কন্যাদের প্রকৃতিতে কখনও ধনীবংশের সাবেকী বনেদীয়ানার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। সবাই আধুনিক প্রগতিশীল ভাবধারার অনুরাগী। কিন্তু পিতামহ স্বর্গীয় রায়বাহাদুর প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তাঁর মধ্যে সংস্কারান্ধ ছুঁৎমার্গ যেমন ছিল—সেইরূপ ছিল রাজকীয় অহমিকা ও তেজস্বীতাও। অতীত দিনের গোড়া কালাপানি বিরোধীদের মত বিদেশী তথাকথিত ম্লেচ্ছদের প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড জাতক্রোধ।

রাজবাড়ীর নাম আঠারো কোঠা। গোয়ালপাড়ার তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার মেজর হাওয়েল একদিন কর্তাবাহাদুরের দর্শনপ্রার্থী হয়ে আঠারো কোঠায় এসে হাজির। তাঁকে বৈঠকখানায় বসিয়ে কর্তাকে খবর দেওয়া হোল। কর্তাবাহাদুর প্রতাপচন্দ্রের মনে বিদেশী বৃটিশ অফিসারদের প্রতি ছিল তীব্র ঘৃণা। তাই তিনি ডেপুটি কমিশনারের দর্শন প্রার্থনা প্রত্যাখান করলেন। হাওয়েল সাহেব ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গেলেন এবং বুঝে গেলেন যে প্রতাপচন্দ্র ঘৃণায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি। এদিকে সাহেব বৈঠকখানার চেয়ার ব্যবহার করেছিলেন জানতে পেরে পরদিন প্রতাপচন্দ্র বৈঠকখানার হাতীর দাঁতের তৈরী তিনটি সুদৃশ্য চেয়ারই ভেঙ্গে চুরমার করে দেন।

একদিন ডেপুটি কমিশনার হাওয়েল সাহেব গৌরীপুরের পথে চলতে চলতে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পড়ে রাজবাড়ীর বাইরের একটি ঘরে

গিয়ে আশ্রয় নেন ; ঘরটির পাকা পোতা ও খড়ের চাল। খবরটা পরদিন কর্তাবাহাদুরের কানে যায়। তিনি তীব্র জাতক্রোধের বশবর্তী হয়ে আদেশ দেন ঘরটি অবিলম্বে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে।

কর্তাবাহাদুরের একটি সৌখিন বজরা ছিল। সরকারী সফরের প্রয়োজনে মেজর হাওয়েল একদিন সেই বজরাটি চেয়ে পাঠালেন। কিন্তু কর্তাবাহাদুর প্রত্যাখান করলেন। মেজর সাহেব আবার একদিন চাইলেন। দ্বিতীয়বার প্রত্যাখান করা ভদ্রতা বিরুদ্ধ মনে করে কর্তাবাহাদুর বজরাটি পাঠিয়ে দেন। কিন্তু বিজাতীয় ঘৃণা ও আক্রোশে তিনি নিজে সেই বজরাটির ব্যবহার বরাবরের জন্য ত্যাগ করেন।

মেজর হাওয়েল তাঁর প্রতি কর্তাবাহাদুরের জাতক্রোধ ও ঘৃণার খবর রাখতেন। তবুও কর্তাবাহাদুর মারা গেলে তিনি রাজবাড়ীতে এসে নিজের মাথা থেকে টুপি খুলে তাঁর মৃতদেহের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন।

কর্তাবাহাদুর শিকার ভালবাসতেন। কিন্তু গুলির আঘাতে শিকার করা হরিণের মাংস তিনি সংস্কারবশতঃ কখনও খেতেন না। না খাওয়ার তাঁর যুক্তি ছিল এই যে আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত ধাতুর তৈরী উত্তপ্ত বুলেট মৃগদেহে প্রবেশ করলে সেই উত্তাপের সংস্পর্শে মাংস পুড়ে যায় অর্থাৎ রান্না হয়ে যায়। সেই রান্না করা মাংসসহ নিহত মৃগদেহ নিজের লোকজনের মধ্যের অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ স্পর্শ করলে তা অপবিত্র হয়ে যায়। কাজেই সেই অপবিত্র মাংস কায়স্থের নিকট অখাদ্য।

এই পরিস্থিতিতে কর্তাবাহাদুরের কখনও মাংস খাওয়ার সখ হলে ফাঁদ বা জালে ধরা হরিণ মেরে মাংস সংগ্রহ করা হতো। এ হেন গোঁড়ামি নিয়ে তিনি সারাজীবন কাটিয়ে গেছেন।

রাজা প্রতাপচন্দ্রকে যখন রায়বাহাদুর খেতাব দেওয়া হয় তখন তিনি সেই খেতাব গ্রহণের জন্য সরকারী দরবারে উপস্থিত হতে

দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। এইরূপ রাজসুলভ তেজস্বীতার দৃষ্টান্তও তাঁর জীবনে বিরল নয়।

রাজা প্রতাপচন্দ্রের পুত্র প্রভাত চন্দ্র প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে খুবই আধুনিক ও প্রগতিশীল ছিলেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করতেন। অতি মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও অভিভাবকেরা নিছক সংস্কারবশতঃ তাঁকে এনট্রান্স (Entrance) পরীক্ষা দেওয়া থেকে নিবৃত্ত করেন। প্রভাতচন্দ্র অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। সর্ববিষয়ে জ্ঞানার্জনের তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। স্কুল ও কলেজীয় বিদ্যায় অভিভাবকরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও শিক্ষার সংস্পর্শ থেকে তিনি নিজেকে কখনও বিচ্ছিন্ন রাখেননি। স্বগৃহে ব্যক্তিগত চেষ্টায় পরিণত বয়সে এসে তিনি শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতি বিষয়ে এতটা বিস্ময়কর বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন যে সমসাময়িককালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে পর্যন্ত উচ্চস্তরের মৌলিক আলোচনায় আপন বৈশিষ্ট প্রদর্শনের অধিকারী হয়েছিলেন। বহু বিষয়ক মূল্যবান পুস্তক সমৃদ্ধ তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পাঠাগারটি তাঁর অত্যুগ্র জ্ঞান পিপাসার সাক্ষ্য বহন করে। গৌরীপুরের বর্তমান স্কুলটি তিনিই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাছাড়া নিজেদের জমিদারীর মধ্যে অনেকগুলি স্কুলের প্রতিষ্ঠা তাঁরই চেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল। বর্তমান কলেজটির জন্য তিনিই জমির ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।

কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের প্রতি প্রভাতচন্দ্রের অনুরাগ সর্বজনবিদিত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি তাঁর সবিশেষ আগ্রহ ছিল। আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের বৈচিত্রের প্রতি তাঁর আকর্ষণও কম ছিল না। এই সঙ্গীতের ব্যাপক সংগ্রহ ও এর আদি ও অকৃত্রিম সুমধুর বৈশিষ্টপূর্ণ ধারাকে সযত্নে রক্ষা করবার জন্য তিনি তাঁর সঙ্গীতানুরাগী জ্যেষ্ঠা কন্যা নীহারবালাকে সর্বদা উৎসাহিত করতেন। তবলায় প্রভাতচন্দ্রের যথেষ্ট দখল ছিল। বলা বাহুল্য রাজবাড়ীর সঙ্গীতাসরে

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ প্রমুখ ভারত বিখ্যাত শিল্পীদের অনেকেরই শুভ-পদার্পণ ঘটেছে। প্রভাতচন্দ্র তৎকালীন কলিকাতার সঙ্গীত সম্মিলনীর সক্রিয় সদস্যও ছিলেন।

গৌরীপুরের বড় রাজকুমারী শ্রীমতী নীহার বড়ুয়ার কাছ থেকে রাজা প্রভাতচন্দ্র সম্বন্ধে একটি কৌতূহলজনক তথ্য সংগ্রহ করা গেছে। যেহেতু ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ভাষার লিপিগত পার্থক্য যথেষ্টই, সেই হেতু সঙ্গীত বিষয়ক সহজবোধগম্য ও সর্বজনগ্রাহ্য কোন স্বরলিপি আবিষ্কারের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নাকি প্রভাতচন্দ্রের যথেষ্ট আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা ছিল। নির্বিকার বসে না থেকে এই উদ্দেশ্যে প্রচুর গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের সর্ব ভাষা ও ধারার উপযোগী একটি নূতন ও তাৎপর্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক নোটেশন পদ্ধতির আবিষ্কারে সফলও হয়েছিলেন এবং এর ওপর সঙ্গীত সোপান নামে একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নানাকারণে তাঁর জীবদ্দশায় সেই পদ্ধতির সার্বিক অনুমোদন ও প্রচলনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

রাজা প্রভাতচন্দ্র সমাজসেবা ও উন্নয়ণমূলক কাজে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। বর্তমান গৌরীপুরের নগর পরিকল্পনা ও তার যথাযথ রূপায়ণ তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হয়েছিল। সুদৃশ্য রাজ-প্রাসাদ ও মাটিয়াবাগ অতিথিশালাটি তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুরুচির নিদর্শন। বলা বাহুল্য প্রভাতচন্দ্রের সময় থেকেই গৌরীপুর রাজপরিবারে প্রাচীন গোঁড়ামী ও রাজকীয় বনেদীয়ানার অবসান ও যুগোপযোগী প্রগতিশীল ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। দেশের রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের কারণে রাজত্ব গিয়েছে। সমাজের অর্থনৈতিক আলোড়ন ও ঘাত প্রতিঘাতজনিত অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য বৈষয়িক বিপর্যয়ের মধ্যে অতীত দিনের সেই পারিবারিক ঠাঁট ও জাঁকজমক নিঃশেষিত প্রায়। তবুও একথা তথ্যসিদ্ধ যে প্রভাতচন্দ্র তাঁর পুত্রকন্যাদের পুরুষানুক্রমিক প্রাচীন অন্ধ সংস্কারের আবর্ত থেকে

বাইরে এনে তাদেরকে যুগোপযোগী ভাবধারায় সর্বতোভাবে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন।

প্রভাতচন্দ্রের প্রকৃতিতে কোনরূপ গোঁড়া ধর্মান্ধতা বা অধ্যাত্মবাদের অস্তিত্ব ছিলনা। তাই বলে তিনি পরমত অসহিষ্ণুও ছিলেন না কখনও।

তিনি অফুরন্ত সাহস ও শৌর্যের প্রতিমূর্তি ছিলেন। সর্বপ্রকার অস্ত্রচালনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। শিকার ও অশ্বারোহণে তাঁর অপরিসীম দক্ষতা ছিল। গোবরডাঙ্গার রাজা জ্ঞানদা প্রসন্ন মুখার্জির সঙ্গে রাজা প্রভাতচন্দ্রের যথেষ্ট ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভারতের বিখ্যাত শিকারী স্বর্গীয় কুমুদনাথ চৌধুরীও শিকার প্রোগ্রামে একাধিকবার গৌরীপুর পরিভ্রমণ করেছিলেন।

রাজা প্রভাতচন্দ্রের প্রথম দুই পুত্রের রুচি ও প্রকৃতির মধ্যে দুটি ভিন্নমুখী ধারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের দুজনকেই বিশেষজ্ঞ ও কৃতী করেছে। কিন্তু শিল্প সংস্কৃতির একটি বিশেষ ভাবধারার পথিকৃৎ হিসেবে রাজা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক ও শিল্পী ৺প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার নাম আজ সারাদেশে যে পরিমাণ সার্বজনীন স্বীকৃতিতে ধন্য ও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, মধ্যম পুত্র প্রকৃতিশচন্দ্র বড়ুয়া অর্থাৎ 'লালজী'র ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। হয়নি তার কারণ প্রকৃতিশচন্দ্র প্রকৃতিগতভাবেই আজীবন প্রচার বিমুখ লোক।

আমি যতটা জেনেছি ও দেখেছি তাতে একথা বলা হয়ত অত্যুক্তি হবেনা যে, বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিচারে লালজীর মত সমপর্যায়ের হস্তী-বিশারদ ব্যক্তি এদেশে খুব কমই আছেন। হস্তীরূপী বিশালদেহ বন্যপশুটি সম্বন্ধে লালজীর অসীম কৌতূহল শৈশব থেকেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই অরণ্য দানবের ইতিবৃত্তে মহাজ্ঞানী হয়েও তিনি বরাবর নীরবে নিভৃতেই রয়ে গেলেন। কখনও তাঁর অগ্রজের মত স্বচেষ্টায় আপন পাণ্ডিত্যে আত্মপ্রকাশ করলেন না।

শিশু হস্তীর দৈহিক আকৃতি, চোখের দৃষ্টি, বাহ্যিক লক্ষণাদি দেখে পরিণত বয়সে সেই হাতী কি প্রকৃতির হবে লালজী সে বিষয়ে সঠিক ভবিষ্যৎ বাণী করবার ক্ষমতা রাখেন।

সুষ্ঠু শিক্ষার মাধ্যমে পোষ মানিয়ে হাতীকে মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে নিয়োজিত করার নজীর সুপ্রাচীন কাল থেকেই। উন্নততর যান্ত্রিক যুগে সামরিক প্রয়োজনে হাতীর কদর যদিও কমেছে, তবুও সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুবিধ কাজে হাতীর ব্যবহার আজও অব্যাহত আছে।

সেই জন্য জঙ্গল থেকে সদ্য ধৃত কমবয়সী শিশু বা কিশোর হাতীর প্রয়োজনানুরূপ সঠিক নির্বাচন সংশ্লিষ্ট খরিদ্দারের পক্ষে একটি কঠিন কাজ। সে কাজে লালজীর পারদর্শিতা সারাদেশে সুবিদিত। এ ব্যাপারে তাঁর মতামতকে সরকারী মহলও যথেষ্ট মূল্য দেন।

হস্তী চিকিৎসায় লালজীর জ্ঞান প্রশংসনীয়। সে চিকিৎসায় ভেষজ পদ্ধতির প্রয়োগেও তিনি সিদ্ধহস্ত। দীর্ঘকাল ধরে বন পরিক্রমায় পোষা ও বুনো হাতীর সংস্পর্শে থেকে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতা আয়ত্ব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

বুনো হাতীর শিক্ষা বিষয়ক নির্দিষ্ট কোন সিলেবাস নেই। সব হস্তী ব্যবসায়ীরই এই বিষয়ক ব্যবস্থাপনায় পদ্ধতিগত কিছুটা মিল আছে। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক লালজী-প্রবর্তিত পদ্ধতির মধ্যে যে যথেষ্ট বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক বিশেষত্ব আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আমি যারপর-নাই মুগ্ধ হয়েছি দেখে যে লালজী পরিচালিত হস্তী-শিক্ষায়তনে এই মহাশক্তিধর বন্য-প্রাণীটিকে বশীভূত করে মানুষের সেবায় শিক্ষিত করে তুলবার মূলমন্ত্র হচ্ছে আন্তরিক ভালবাসা ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার। বলা বাহুল্য হস্তী-মনস্তত্ত্বে তার প্রতি কোমল ও কঠোর ব্যবহারের ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া নিশ্চিতই অতি গভীর ও সুদূরপ্রসারী।

তাই লালজীর প্রতিষ্ঠানের নীতি হচ্ছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী হাতীকে সদাসর্বদা আপনজনের মত মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে রাখা যাতে সে ধীরে ধীরে তার পরিচারক তথা মাহুতের কথা বা নির্দেশ সঠিকভাবে বুঝতে ও মানতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

দেখেছি, প্রতিষ্ঠানগত এই বৈশিষ্ট বজায় রাখবার জন্য লালজীকে সর্বদা দ্বিমুখী দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রথমত নবাগত কর্মীদের তাঁর প্রতিষ্ঠানের গৃহীত নীতিতে উদ্বুদ্ধ ও পদ্ধতিতে সচেতন করে তোলা। দ্বিতীয়ত বুনো হাতী ধরা থেকে বিক্রী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক নির্দিষ্ট কার্যাদি ও গোটা ক্যাম্পের সুষ্ঠু ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

তরাই অরণ্যের রায়মনা ক্যাম্পে বসে লালজী একদিন তাঁর সহযোগী কর্মীদের পরিচয় দেবার সময় মন্তব্য করলেন—'প্রতিষ্ঠানের মালিক আমি নিজে হলেও এরা সবাই আমার কমরেড'।

কমরেডই বটে। নিছক অভিধানিক অর্থের কমরেড নয়। বাস্তব জীবনের কষ্টিপাথরে যাচাই করা ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধায় উদ্বুদ্ধ—আত্মিক আনুগত্যের স্বেচ্ছা-বন্ধনে আবদ্ধ প্রকৃত কমরেড তারা। যে আনুগত্য আত্মত্যাগের প্রেরণা জাগায় সে আনুগত্য নিশ্চিতই অতিমানবিক, স্বর্গীয়। তাইতো ১৯৪৫ সালে গারোহিলের গুণ্ডা-হাতীর আক্রমণে নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠাবান অনুগত-প্রাণ লালজীর বিশ্বস্ত সঙ্গী ভবেনের পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল—

'আমার জীবনটাই কি বেশী মূল্যবান? আপনাকে এই বিপদের মধ্যে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মৃত্যু যদি আসে, এক সঙ্গেই মরবো'।

এই সেই কিশোর ভবেন—ভবেন্দ্র সিংহ রায়, যে আট বছর বয়সে প্রথম লালজীর সংস্পর্শে আসে।

লালজীর বাঘ শিকারের ক্যাম্প পড়েছে প্রতাপগঞ্জে। সঙ্গে ২৫টি শিকারী হাতী। একটি আট বছরের সন্ত্রস্ত কিশোর বালক প্রায়ই

ক্যাম্পের ধারে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে শুণ্ডধারী বিশালদেহ হাতীগুলোর দিকে। বালকের মনে অসীম কৌতূহল। কোন্ মন্ত্রে জঙ্গলের এত বড় বড় জানোয়ারগুলো ক্ষুদ্র-দেহ মানুষের পোষ মানলো? কি করেই বা এরা স্কুলের ছাত্রের মত মানুষ-গুরুর কথা বুঝছে, মানছে—চলছে, উঠছে, বসছে, পিঠে শিকারীদের বসিয়ে নিয়ে জঙ্গলে বাঘ মারতে যাচ্ছে?

গ্রাম্য কিশোর-মনের কৌতূহল বাগ মানে না। কয়েকদিন থেকেই মনটা উসখুস করছে কিছু জানবার জন্যে। কিন্তু অত বড় বড় জানোয়ারগুলোকে যারা সামলাচ্ছে তাদের মন মেজাজ জানা নেই। তাই কথাগুলো বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত আর সাহসে কুলোয়নি।

নিজের হাতীটাকে বেঁধে এসে একপাশে বসে আপন মনে বেশ আমেজী মেজাজে বিড়ি টানছে মাহুত নবীন রায়। চেহারায় বিশেষ রুক্ষতা নেই। মেজাজটাও যেন একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ঠেকে।

'যাবো নাকি ধারে। রেগে যাবে নাতো'?

ভয় ভয় করে বালকের মনে।

ওদিকের হাতীর লোকগুলোর কথাবার্তা কানে আসে—'ক্যাম্প উঠে যাবে দু'চারদিনের মধ্যে'।

'তা' হলেতো আর দেরী করা চলে না।

ছেলেটি সসঙ্কোচে ও সমীহভরে এগিয়ে গেল মাহুত নবীনের দিকে। একটু ঘুরপথেই এগুচ্ছে।

ধারে কাছের হাতীটা যেভাবে সমানে শুঁড় নাড়াচ্ছে—বলা যায়না, এক হেঁচ্‌কা টানে হয়ত তুলে নিয়ে আছাড়ে দেবে।

কিশোর মনের নানান দুশ্চিন্তা।

নবীন রায় আয়েস করে বিড়ি টানছে আর আড়চোখে বালকটিকে দেখছে।

একটু দূরে এসে বালকটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। চোখ মুখে তার একটু ভ্যাবাচ্যাকা ভাব।

'কে রে তুই ছেলেটা' ?

'আজ্ঞে, আমি ভবেন—মানে ভবেন সিংহ রায়'।

'এখানে কি কাজে' ?

'আজ্ঞে, হাতী দেখছি'।

'হাতীর আবার দেখবার কি আছে' ?

'না—মানে, কত বড় শরীর ওদের। শুঁড়, দাঁত'।

এক কথা দু'কথায় সংকোচ কাটে এবং ভাবসাব জমে ওঠে ভবেনের সঙ্গে নবীন রায়ের। ক্যাম্প তারপর যে কয়দিন ছিল ভবেন রোজ যেত হাতী দেখতে ও নবীনের সঙ্গে আলাপ করতে।

আগের দিন দুপুর থেকেই গোছগাছ স্থুরু হয়েছে পুরোদমে। কাল ক্যাম্প উঠে যাবে। ভবেন ঘুর ঘুর করছে নবীনের পেছনে। বড্ড বিচ্ছিরি লাগে মনটা তার।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ভবেন তখনও নবীনের পেছনে।

'কি রে ভবেন, অন্ধকার হয়ে এল—বাড়ী যাবি না' ?

'যাবো'।

'কতদূর তোর বাড়ী ? বাপ মাকে বলে এসেছিস তো' ?

বাবা মাকে বললে কি আর আসতে দেয় ? এখনি জোর পায়ে হাঁটা দেবো। মাইলটাক দূরের বিচনদই গ্রাম আমাদের। কাল কখন যাবেন আপনারা ?

'খুব ভোরে'।

'সব হাতী চলে যাবে' ?

'সব যাবেনতো কি দু'চারটে তোদের দেখবার জন্যে পড়ে থাকবে' ?

'একটা কথা শোনবেন' ?

'বলনা—কি বলবি' ?

'না—মানে আমারে নেবেন আপনারগে হাতীর দলে' ?

'সে কিরে ? হাতীকে তোর ভয় করে না' ?

'এখন করে—পরে আর করবে না যেমন আপমনারগে করেনা'।

'ঠিক বলেছিস। কিন্তু তোর বাপ মা রাজী হবেন'?

'হবেন না বলেইতো না বলে যাবো'।

নবীন হাসে ভবেনের কথায়। এ কয়দিনে বড্ড মায়া বসেছে ছেলেটার ওপর।

'আচ্ছা, তুই একটা কাজ কর। একদিন চলে আয় গৌরীপুরে। হাটবারে অনেক লোক যায় এদিক থেকে! তুই তাদের সঙ্গে চলে যাবি। তোর কথাটা আমি বাবার কাছে পেড়ে দেখবো'। লালজীকে তাঁর কর্মীরা শ্রদ্ধাবশে 'বাবা' ডাকে।

নবীনের কথায় ভবেন উৎফুল্ল হয়। মতলবটা মনে মনে রাখে। রবিবার ও বুধবারে গৌরীপুরের হাট। বিচনদই গ্রাম থেকে অনেক বাঁশ বোঝাই গরু ও মোষের গাড়ী গৌরীপুরে যায়। দূরত্ব মাইল দশেক। বাঁশ বোঝাই গাড়ীগুলো আগের দিন সন্ধ্যায় রওনা দেয়। ভবেন তাকে তাকে থাকে।

নির্দিষ্ট দিনের সন্ধ্যায় বালক ভবেন গোপনে গ্রামের একটি বাঁশ বোঝাই গাড়ীর পিছু নেয়। গাড়ী মন্থর গতিতে এগোয়— আর ভবেন অন্ধকারের আড়ালে গাড়ীকে অনুসরণ করে চলে। সাত আট মাইল যাবার পর বিশ্রাম নেবার জন্যে গাড়ী থামে। গাড়োয়ান ভবেনকে দেখে ফেলে।

'কি রে? তুই পেছনে? কোথায় যাচ্ছিস'?

গৌরীপুর। কাজ আছে'।

'বাপ মা জানে'?

'জানে'। মিথ্যা হলেও চটপট উত্তর দেয় ভবেন।

'তাহলে গাড়ীতে উঠে বস'।

গাড়োয়ান চেনা জানা গ্রামের লোক। গৌরীপুর পৌঁছেইতো তাকে না বলে সট্‌কে পড়তে হবে। গাড়ীতে চাপলে সে কাজে অসুবিধা হবে। ভবেন ভয়ে ভয়ে হেঁটেই চলে।

বাঁশের গাড়ী ভোর ভোর গৌরীপুর পৌঁছে গেল। আর পেছন থেকে ভবেনও চম্পট দিল।

নবীন মাহুত ডেরায় পৌঁছনোর রাস্তাঘাট বাতলে দিয়েছিল। লোকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে ভবেন পৌঁছে গেল সেখানে। নবীনের সঙ্গেও দেখা হোল। ছোকরা যখন এসেই পড়েছে তখন কি আর করা? নবীন আপাতত তাকে চার পাঁচ দিন লালজীর অজ্ঞাতেই হাতীর ধুরায় (বাথানের মত) রেখে দিল।

নতুন পরিবেশে ভবেনের কিশোর মনে একটু সন্ত্রস্তভাব। সবার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের পর আড়ষ্টভাবটা তার ক্রমেই কমে আসে। বাড়ীর কথা মনে আসে ভবেনের। বাঁশের গাড়োয়ানের কাছ থেকে বাবা মা জানবে হয়ত। কিন্তু গৌরীপুর পৌঁছে কোথায় গিয়েছে খোঁজ পাবেনা কিছুতেই।

হাতী-ধুরার জমাদার তখন ছিল জামারুদ্দিন। মহারাজার আমলের প্রবীণ লোক। নবীন মাহুত জামারুদ্দিনের মাধ্যমে ভবেনের প্রসঙ্গটা লালজীর কানে তুললো। লালজী নির্দেশ দিলেন কোন একটা হাতীর মাহুতের সঙ্গে রেখে কাজ শেখাতে। তখনকার ধুরার হাতী ছিল—জংবাহাদুর, কিষণলাল, ময়ালু, রনজিৎ, বঙ্গবীর ইত্যাদি।

রনজিৎ হাতীর মাহুত জাফর সেখ। ভবেনকে জাফরের সঙ্গে রাখা হোল। মাহুত জাফর ছিল বড্ড খিটখিটে বদমেজাজী। ভবেনকে সে প্রথম থেকেই সুনজরে দেখতো না। কথাটা আবার জমাদার জামারুদ্দিনের মুখ দিয়ে লালজীর কানে গেল। লালজী মাহুত জাফরকে ডেকে পাঠালেন। জাফরের অভিযোগ—ছোকরা কোন কাজই পারেনা। লালজীর মনে সন্দেহ হয়। বললেন—ছেলেটিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে। নিজে কথা বলতে চান।

শান্ত শিষ্ট সপ্রতিভ কিশোর ভবেনকে দেখে লালজীর ভালই লাগলো। তাকে নিজের বাড়ীতেই রাখলেন, এবং পড়াতেও আরম্ভ

করলেন। বিশালদেহ হাতীর চিন্তা যার সারা মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে লেখা পড়ায় তার মন বসবে কেন? ঘসে মেজে কোন রকমে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত উঠে পড়া ছেড়ে দিল সে। ছেড়ে দিলেতো কি হয়েছে? লালজী হাল ছাড়লেন না। ইতিমধ্যে ভবেন নিজ গুণে রাজবাড়ীর সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। পড়াশুনায় কাঁচা হলেও অন্য কাজে ছেলেটির উৎসাহ ও আন্তরিকতার অভাব নেই। লালজী তাই সর্বক্ষণের জন্য তাকে শিকার ও বুনো হাতী ধরার অভিযানে নিজের সংস্পর্শে রেখে ঐ সংক্রান্ত সর্বকাজে পারদর্শী ও জঙ্গলের ক্যাম্প জীবনে অভ্যস্ত করে তুলতে সচেষ্ট হলেন।

ভবেনের ক্ষেত্রে লালজীর সে চেষ্টা যে ষোল আনা সফল হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্ত্তী জীবনে ভবেন স্বীয় যোগ্যতায় লালজীর অতি অনুগত ও নির্ভরযোগ্য পার্শ্বচর হিসেবে নিজেকে উন্নীত করতে সমর্থ হয়। শুধু তাই নয়, দায়িত্বশীলতা, সততা ও চারিত্রিক মাধুর্যে সে গোটা রাজবাড়ীর মন জয় করে নেয়। রাজবাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠদের সে স্নেহভাজন, বয়োঃকনিষ্ঠদের শ্রদ্ধাভাজন ও সমবয়সীদের সে বন্ধুস্থানীয় আপন জনের মত।

লালজীর শিক্ষায় ভবেন সর্বপ্রকার শিকারেও পারদর্শিতা অর্জন করে। বন্দুক, রাইফেল চালনায় সে দুরন্ত ও স্থিরলক্ষ্য। বিপজ্জনক শিকার অভিযানে ভবেন তাই লালজী তথা তাঁর পরিবারের সকল পুরুষ ও মহিলা শিকারীদের অতি নির্ভরযোগ্য সহ-শিকারী।

১৯৫৪ সালের এপ্রিলে তুলসীঝোরার শিকার ক্যাম্পে যোগ দিয়ে লালজীর জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিমা ভবানীপুর এলাকায় ৯ফুট ৪ইঞ্চি দৈর্ঘের যে দুর্দান্ত বাঘটিকে শিকার করে—তার জোড়ের বাঘিনীকে (৮ ফুট ১০ ইঞ্চি) ভবেন নিহত করে তার এক সপ্তাহের মধ্যেই ঐ অঞ্চলের বাঁশবাড়ি গ্রামে। ভবেনের সেই শিকার কৃতিত্ব সকলের প্রশংসা পেয়েছিল।

গৌরীপুরের রাজবাড়ী নৃত্য-গীতের পীঠস্থান। হস্তীঅন্তপ্রাণ ভবেনের মধ্যে যে সঙ্গীত বিষয়ক কোন গুণ ও অনুরাগ সুপ্ত থাকতে পারে তা এ বাড়ীর কারো কল্পনায় ছিলনা। কিন্তু ধীরে ধীরে সে গুণের প্রকাশ পায় রাজবাড়ীর সঙ্গীত মুখর আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে এবং ভবেন পরবর্ত্তীকালে অসমীয়া লোক সঙ্গীত ও দোতারা বাদনে পারদর্শী হয়ে ওঠে। স্বনামধন্যা সুগায়িকা ও নৃত্যপটিয়সী প্রতিমার সহ-শিল্পী হিসেবে আসাম গ্রুপের সঙ্গে সে ১৯৬৫ সালে নয়াদিল্লীতে সরকারী স্বাধীনতা উৎসবেও যোগদান করে।

বাইরের যে কোন ক্যাম্পে লালজীর সাময়িক অনুপস্থিতিতে ভবেনই হচ্ছে তাঁর মুখপাত্র ও মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক।

ভবেনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৭২ সালের এপ্রিলে রায়মনা ক্যাম্পে। বলা বাহুল্য, লালজীর আমি বন্ধু অতিথি বলেই নয়—ভবেন তার প্রকৃতিগত সৌজন্যবোধেই আমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়টুকু সশ্রদ্ধ ও অমায়িক আপ্যায়নে ও ব্যবহারিক মাধুর্যে সামান্য কয়েকটা দিনের মধ্যেই স্মরণীয় করে দিয়েছিল।

রায়মনা রেঞ্জে থাকাকালীন এইভাবে আমি লালজীর হাতীধরা দলের ফাঁদি, মাহুত, কামলা বা পাতাওয়ালা প্রভৃতি সমস্ত কর্মীদের সংস্পর্শে এসেছিলাম, যাদের পেশাগত ঘটনাবহুল জীবন-ইতিহাস অতীব চিত্তাকর্ষক ও রোমাঞ্চকর। ভবিষ্যতে সে কাহিনী আমি বিস্তারিতভাবে কৌতূহলী পাঠকবর্গের নিকট পরিবেশনের আশা রাখি।

জঙ্গল ঢুঁড়ে শুধু হাতী ধরলেইতো কাজ শেষ হয়না। সেই বুনোদের প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে সত্বর বিক্রির ব্যবস্থাও করতে হয়। নইলে হাতীর খোরাক জোগাতে হিমসিম খেতে হয়। তাই বিক্রির দায়িত্বে এজেন্ট নিযুক্ত থাকলেও সে কাজের তদারকির জন্য দৌড় ঝাঁপও কম নয়। লালজীর নিজের ট্রেলরযুক্ত একটি জীপগাড়ী আছে। বিক্রী-ক্যাম্পের সাজ সরঞ্জাম সহ সেই

জিপ নিয়ে লালজীকে টহল দিয়ে ফিরতে হয় পশুপাখী বিক্রীর মেলাগুলিতে।

সেই মেলাগুলির উল্লেখযোগ্য সবগুলিই হচ্ছে বিহার রাজ্যে। যথা—রাসপূর্ণিমায় ছাপরা জেলার শোনপুরের মেলা, শিবরাত্রিতে সাহরন জেলার সিঙ্গেশ্বর থানের মেলা, জানুয়ারী মাসে পূর্ণিয়া জেলার খাগড়ার মেলা, কার্তিক মাসের বিবাহ পঞ্চমীতে মজঃফরপুর জেলার সীতামারীর মেলা, পূর্ণিয়া জেলার জমিদার প্রবর্তিত বুধেলীর মেলা ইত্যাদি।

ঐ সব মেলার কর্তৃপক্ষ মহল লালজীকে অত্যন্ত সমীহ করেন ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। বিশেষ করে হাতী কেনাবেচা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে পরামর্শের জন্য তাঁরা, লালজী স্বয়ং উপস্থিত থাকলে, তাঁর কাছেই আসেন এবং তাঁর মতামতকে যথেষ্টই মূল্য দেন।

লালজীর আরণ্যক জীবনের বাইরে সামাজিক জীবনের ব্যক্তিগত প্রতিপ্রত্তি গোটা গোয়ালপাড়া জেলায় তাচ্ছিল্য করবার মত নয়। তাইতো নির্বাচনের সময় এতদঞ্চলীয় সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের পক্ষে লালজীর সমর্থন তাদের সাফল্যকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। তিনি নিজে একবার বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

লালজীর হাতি ধরা অভিযান প্রসঙ্গে একজনের কথা না বললে তৎসংক্রান্ত সমগ্র বর্ণনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। সে হচ্ছে লালজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রদীপ বড়ুয়া—ওরফে বাবলু। 'এলিফ্যাণ্ট বয়' সাবুর দুঃসাহসিক কার্যকলাপ একসময় আমাদের তথা দেশ-বিদেশের সিনেমা দর্শকদের মনে চমক জাগাতো। লালজীর পুত্র বাবলুকে আসাম অরণ্যের অনুরূপ 'এলিফ্যাণ্ট বয়' বললে অত্যুক্তি হবেনা।

গৌরীপুর রাজপরিবার পরিচালিত শিকার ও হাতীধরা ক্যাম্পে পরিবারের স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের যোগদান রাজা প্রভাতচন্দ্রের সময় থেকেই একরূপ চিরাচরিত প্রথা হয়ে

দাঁড়িয়েছিল। প্রভাতচন্দ্র স্বর্গারোহন করেন ১৯৪২ সালে। তাঁর মৃত্যুর পরও শিকার ক্যাম্প ও লালজী পরিচালিত হাতীধরা ক্যাম্পে বাড়ীর বয়স্কদের যাওয়া আসা ছিল। বাবলুও যেতে সুরু করে তার শিশু বয়স থেকেই। হাতীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে যাবার ঝোঁক থাকলেও বাবা বাধা দিতেন। কিন্তু হাতীকে স্বহস্তে সতর্কতার সঙ্গে খাওয়ানোতে কোন বাধা ছিল না। হাতীকে আদর করা ও তার পিঠে ওঠা সুরু হয় বাবলুর প্রায় দশ বছর বয়স থেকেই।

বাবলু যখন যুবক তখন একদিন সে এক তুঃসাহসিক কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে। লালজীর দলে মধুমালা নামে এক বদমেজাজী হাতী ছিল। একদিন সে হঠাৎ তার কামলাকে পিঠে নিয়েই পালাতে থাকে। বিভিন্ন চা বাগানের মাঝ দিয়ে মানুষজনকে আতঙ্কিত করে মধুমালা ছুটতে থাকে উত্তরে ভুটানের বড় জঙ্গলের দিকে। হাতী হারানোর ক্ষতিতো আছেই—তার চাইতে জরুরী-সমস্যা হোল ছুটন্ত হাতীর পিঠ থেকে কামলাকে উদ্ধার করতে না পারলে তার জীবন সংশয় ঘটবে। মহা বিপদ। কি করা যায় এই পরিস্থিতিতে ?

বাবলু তখন যুবক। কালবিলম্ব না করে সে চেপে বসলো ক্যাম্পের অন্য এক বিশ্বস্ত হাতীর পিঠে এবং ছুটলো মধুমালার গন্তব্য পথ ধরে। পথিমধ্যের খবরে জানা গেল মধুমালা এক রোখে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে ভুটান পাহাড়ের দিকে। বাবলু একটু ত্যারসাভাবে নিজের হাতী চালিয়ে পাশের দিক থেকে বেড় দিয়ে গিয়ে বিপজ্জনক ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে মধুমালাকে পাকড়াও করলো সাত মাইল দূরে একটি নদীর মধ্যে। আর সামান্য দেরী হলেই মধুমালা ভুটানের তুর্গম পাহাড়ী জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যেত।

১৯৭১-৭২ সালের পুরো মহালটায় লালজীর হাতী ধরার ক্যাম্প ছিল উত্তরবঙ্গের তরাইয়ের জঙ্গলে। জানুয়ারী মাসে ক্যাম্প চালু ছিল বক্সার ফরেষ্ট ডিভিশনের ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে হাতীপোতা

নামক জঙ্গল এলাকায়। বাবলু এখানে তার পিতৃদেবের সংস্পর্শে থেকে প্রত্যক্ষভাবে ক্যাম্প পরিচালনা ও মেলা শিকার কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেছে।

হাতী ধরার দল বেরুচ্ছে বুনো হাতীর তল্লাসে। দলের ফাঁদি হচ্ছে ভবেন, তীর্থ, মন ও হাকিম। বাবলুও তাদের সঙ্গী হোল। প্রথম রাত কাটালো তারা গিয়ে রাজাভাতখাওয়ায়। সেখান থেকে ভোর চারটায় রওনা দিয়ে দক্ষিণবাহী ডিমা নদীর উজানে দুই তীরের সল্ট লিকে (Salt-lick) বুনো হাতীর পায়ের দাগ খুঁজতে খুঁজতে উপরে গিয়ে রায়সাটাং এলাকায় হাতীর টাটকা লেদা (নাদি) চোখে পড়লো। বুনোর দলে প্রায় পনেরো বিশটা হাতী। সামনে এগিয়ে গেছে তারা ঘন জঙ্গলের দিকে।

বেলা তখন প্রায় বারোটা। বাবলু তার পোষা হাতীর পিঠ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে মাটিতে বুনো হাতীর পায়ের ভাঁজ (পায়ের দাগ) ধরে এগুচ্ছে। হাতীর পিঠে বসে ফাঁদিদের নজর এলো সামনেই স্বল্প দূরে ঘন জঙ্গলে বুনোর দল চরছে। মুখে সতর্কতাসূচক সিটি দিয়ে তারা পরস্পরকে জানান দিলে। বাবলু একটু দূরে ছিল। অন্যমনস্কতার দরুণ সিটি তার কানে যায় নি। বুনো হাতীর হদিস পেলে মুখে কথা বলা নিষেধ। অথচ নিরাপত্তার প্রয়োজনে মাটিতে অবস্থিত বাবলুকে এখুনি তুলে নেওয়া দরকার। দু'জন ফাঁদি তাদের দু'টো হাতীকে জোরে চালিয়ে বাবলুর দু'পাশ দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। এবার বাবলু বুঝলো ব্যাপারটা এবং চটপট নিজের হাতীতে উঠে পড়লো।

বন-রোমাঞ্চের মধ্যে বাবলুর যুব মনে প্রতিযোগিতাসুলভ উৎসাহ জাগে। তার হাতী জোর কদমে এগিয়ে গেল সামনে। বুনোর দল নাগালের মধ্যে। বাবলুর চোখ চরকির মত ঘুরছে কমবয়সী বাচ্চা হাতীর খোঁজে। একটি কিশোর হাতী কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে চরছে একপাশে। বাবলু এগুলো সন্তর্পণে তার দিকে এবং পাশ থেকে

ফাঁস ছুঁড়ে তাকে পাকড়াও করে ফেললে। · সুরু হোল ধ্বস্তাধ্বস্তি। ওস্তাদ ফাঁদিও হাত লাগাল রশিতে। বাচ্চাটা বেগতিক দেখে ভয়ে একটা ডাক দিল। মা তার দূরে চরছিল। ডাক শুনে বাচ্চাকে বাঁচাতে ছুটে এলো সে রণং দেহি মূর্তিতে। বাবলু কোমরে ঝোলানো খাপ থেকে তীক্ষ্ণধার ভুটানী ভোজালি বের করে শক্ত মুঠোয় বাগিয়ে ধরলে।

আক্রমণমুখী হস্তিনী মা জঙ্গল ভেঙ্গে তেড়ে আসছে তার শত্রুর দিকে। ওকে রোখা হয়ত মুশকিল হবে। অন্য ফাঁদিরা জঙ্গলে রেখেছিল বাড়তি শিকারের খোঁজে। বিপদ বুঝে তারাও তাদের হাতী নিয়ে ছুটে এলো বাবলুদের সাহায্যে এবং জংলী হস্তিনীকে খেদিয়ে দিল তারা সবাই একজোটে।

আমার একটি অরণ্য-ভিত্তিক উপন্যাসের কাহিনীকে চলচ্চিত্রে রূপায়নের উদ্দেশ্যে একজন বাঙ্গালী প্রযোজক নায়ক-নায়িকা এবং সহ-শিল্পীদের নিয়ে কলকাতা থেকে আসামের রায়মনা রেঞ্জে গিয়ে ক্যাম্প করেছিলেন পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক সুটিং প্রোগ্রামে। তাঁরা লালজীর পোষা হাতীগুলি ব্যবহার করেছিলেন তাঁদের কাজে। সৌভাগ্যবশতঃ আমি লালজীর অতিথি হিসেবে তাঁর ক্যাম্পে ছিলাম ঐ সময়।

ফিল্ম কোম্পানির পরিচালক ভদ্রলোকের অনুরোধে লালজীর পুত্র বাবলু কাহিনীর মধ্যে সন্নিবেশিত একটি ফাঁদির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফাঁদির গার্হস্থ্য জীবন, দীর্ঘদিনের জন্য হাতীধরা অভিযানে বেরুনোর সময় দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ, হস্তী আরূঢ় অবস্থায় বন পরিক্রমা প্রভৃতি কঠিন দৃশ্যে অনভিজ্ঞ বাবলু এমন সাবলীল ও সুন্দর অভিনয় করেছিল যে দেখে কলিকাতাবাসী আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

সেইদিন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে সুযোগ পেলে এই সুশ্রী ও সুঠামদেহ অসমীয়া যুবক বাবলু চলচ্চিত্র জগতে একদিন

হয়ত দ্বিতীয় সাবু তথা 'এলিফ্যাণ্ট বয়' রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে।

লালজী নিজেও অতীতে 'বিগ হাণ্ট', 'মাহুত বন্ধুরে' প্রভৃতি চলচ্চিত্রে হস্তী পরিচালকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

রায়মনায় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ও শিল্পীরাও বাবলুর অভিনয় নৈপুণ্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। আমিও লালজীকে তাঁর পুত্রের সুপ্ত প্রতিভা ও ভবিষ্যৎ জীবনের তৎবিষয়ক সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলাম। বাবলুর সঙ্গে আলোচনায় আমি তাকে আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করেছিলাম এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলাম যে তার এই যোগ্যতার বিষয়ে আমি চলচ্চিত্র মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করবো।

বলাবাহুল্য আমাদের দেশের চলচ্চিত্র জগতে শিল্পী নির্বাচনে গতানুগতিক চটকদারীর মোহটাই বেশী। দু' একজন প্রখ্যাত পরিচালক ছাড়া নূতন প্রতিভা আবিষ্কারের ঝোঁক কারো মধ্যেই নেই।

পুত্র কন্যাদের শিকার শিল্পে পারদর্শী করে তুলবার জন্য রাজা প্রভাতচন্দ্রের অপরিসীম আগ্রহ ছিল। নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রেখে তিনি সবাইকে রাইফেলের টারগেট প্রাকৃটিস করাতেন। মাটিয়াবাগ টিলা সংলগ্ন সুটিং রেঞ্জে ক্লে-পিজিয়ন সুটিং এর ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। লালজী ছিলেন শৈশব থেকেই পিতার সর্বক্ষণের শিকারসঙ্গী। নয় দশ বছর বয়স থেকেই তিনি এয়ার-গানে টারগেট প্রাকৃটিসে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। অনেক শিকারী আছেন পাখী শিকারে হাত পাকান। লালজী পাখী মারা পছন্দই করেন না।

হাতীর পিঠে বসে শিকারের পদ্ধতিগত সমীচিনতার সমালোচনার উত্তরে লালজী একদিন আমার কাছে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন— 'গভীর ও দুর্গম উঁচু ঘাস জঙ্গলের মধ্যে হাতীর পিঠে ছাড়া শিকার

বাস্তবে অতি দুরূহ ব্যাপার। ছাদ সমান উঁচু ঘাস জঙ্গলে উড়ন্ত পাখীর উদ্দেশ্যে আমাদের এমন, হিসেব কষে গুলি ছুঁড়তে হতো যাতে পাখী হাতীর পিঠে বা পায়ের ধারে এসে পড়ে। দূরে পড়লে সে- পাখীর সন্ধান পাওয়া অসম্ভব ছিল। কাজেই সংশ্লিষ্ট শিকারীর লক্ষ্যভেদে কতটা দক্ষতা থাকলে পর হস্তীবাহনে দোদুল্যমান শরীরে বসে নির্ভুল হিসেবে গুলি চালিয়ে উড়ন্ত পাখীকে ইচ্ছামত নিজের অবস্থানস্থলে নামিয়ে আনা সম্ভব সে কথাটা বিচার করে দেখা দরকার।

আসামের জলাভূমির ঠাসা ঘাস জঙ্গলে বিপজ্জনক প্রাণী শিকারেও হাতী ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ প্রথমতঃ হাতীর দ্বারা খেদিয়ে ছাড়া ঘাস বনে কোন প্রাণীর হদিস পাওয়া ও তাকে নির্দিষ্ট দিকে চালিত করা অসম্ভব। তাছাড়া ঐরূপ গভীর জঙ্গলে, যেখানে স্বল্প দূরেও দৃষ্টি চলে না, সেখানে মাটিতে দাঁড়িয়ে বিপজ্জনক প্রাণীর সম্মুখীন হওয়া চরম হঠকারিতারই সামিল। দ্বিতীয়ত হাতীর পিঠে বসে ছাড়া ঘাসবনে গতিশীল কোন প্রাণীর চলাচলের হালি—অর্থাৎ আলোড়ন আবিষ্কার করা অসম্ভব। তৃতীয়তঃ বিপজ্জনক শিকারে গুলি নিক্ষেপের সময় বাহন হাতীকে সবসময় স্থির ও নিশ্চল আশা করা বাতুলতা। সেক্ষেত্রে আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় সংশ্লিষ্ট শিকারীর দক্ষতা কোন্ পর্যায়ে উন্নীত হলে পর একটি অস্থির বাহনে বসে গতিশীল আক্রমণমুখী বা পলায়নপর জানোয়ারের ওপর স্থিরলক্ষ্যে গুলি নিক্ষেপ করা সম্ভব সেটা বিচার্য বিষয়। চতুর্থতঃ হস্তীবাহনে শিকারীকে সফলতার প্রয়োজনে অন্য একটি বিষয়েও একসঙ্গে দক্ষতা অর্জন করা অপরিহার্য। তা' হচ্ছে—অস্থিরতার মধ্যে বসে লক্ষ্যবস্তুর ওপর অব্যর্থ নিশানায় গুলি নিক্ষেপের প্রয়োজনে বাহন হাতীর পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট মাহুতকে সঠিক ও সময়োচিত নির্দেশ দান। মনে রাখা দরকার উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে সে কাজ মোটেই সহজ নয়।

কাজেই হস্তীবাহনে শিকার পদ্ধতির সমালোচকদের উদ্দেশ্যে লালজীর বক্তব্য হচ্ছে—আগে তাঁরা এই আর্টের পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট, গুরুত্ব ও পরিস্থিতিগত অপরিহার্যতাকে অনুধাবন করুন—তারপর সমালোচনা করবেন।

রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া ও তাঁর বংশধরদের শিকার শৌর্যের কৃতীত্বপূর্ণ তালিকা কৌতুহলী পাঠক মহলের সামনে উপস্থাপিত করার লোভ আমি সম্বরন করতে পারছি না। আমি এক্ষেত্রে শুধু বাঘ ও চিতাবাঘ শিকারের তালিকাই দিচ্ছি।

	বাঘ	চিতাবাঘ
রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া ···	১১৬	১০০
বড় রাজকুমার প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া ···	৫৪	২৮
মেজ রাজকুমার প্রকৃতিশচন্দ্র বড়ুয়া (লালজী)	৬১	১১১
ছোট রাজকুমার প্রণবেশ চন্দ্র বড়ুয়া ···	১১	১৪
বড় রাজকুমারী নিহারবালা বড়ুয়া ···	৬	১
ছোট রাজকুমারী নীলিমাসুন্দরী বড়ুয়া ···	৪	—
অলকেশ বড়ুয়া (বড় রাজকুমারের জ্যেষ্ঠপুত্র)	৪	৪
শ্যামলেশ বড়ুয়া (ঐ কনিষ্ঠ পুত্র) ···	—	২
মুনীন্দ্র নারায়ণ বড়ুয়া (বড় রাজকুমারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র)	৩৩	২৯
মৃণাল বড়ুয়া (ঐ দ্বিতীয়পুত্র) ···	৫	৭
অভিজিৎ বড়ুয়া (ছোট রাজকুমারীর পুত্র)	১	১
প্রতিমা বড়ুয়া (মেজ রাজকুমার লালজীর জ্যেষ্ঠা কন্যা)	১	৬
পূর্ণিমা বড়ুয়া (ঐ দ্বিতীয়া কন্যা) ···	—	১
	২৯৬	৩০৪
শিকারসঙ্গী অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কর্তৃক	২৪৪	১৪৯
মোট···	৫৪০	৪৫৩

প্রথম শিকার	বাঘ	চিতাবাঘ
রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া	১৮।৩।৯৪ খৃঃ তারিখে	
বড় রাজকুমার প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া ১৮।৩।১৫	,,	২।৯।১৫ খৃঃ তারিখে
মেজ রাজকুমার প্রকৃতিশচন্দ্র বড়ুয়া (লালজী) ১৬।৩।২৬	,,	১০।১০।২৪ ,,
ছোট রাজকুমার প্রণবেশচন্দ্র বড়ুয়া ২৫।৩।৩৩	,,	১৪।৫।৩২ ,,
বড় রাজকুমারী নিহারবালা বড়ুয়া ১৯।৪।৩৩	,,	———

মেজ রাজকুমার লালজীর প্রথম বাঘ শিকার ১১ বছর ১০ মাস বয়সে। তাঁর শিকার করা ৬১টির মধ্যে সর্ববৃহৎ বাঘের দৈর্ঘ্য ১০ ফুট ৫ ইঞ্চি। প্রথম চিতাবাঘ শিকার ১০ বছর ৫ মাস বয়সে। ১১১টির মধ্যে সর্ববৃহৎ চিতাবাঘের দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ২ ইঞ্চি।

লালজীর হাতী ধরার হিসাব ১৯৭১ সাল পর্যন্ত

মেলা শিকারে—অর্থাৎ দড়ির ফাঁসে--৪৮৭ (নিজের হাতে ধরা সমেত)

খেদা পদ্ধতিতে—২৭৮

মোট- -৭৬৫

গৌরীপুর রাজপরিবারের শিকার ক্ষেত্রের গভীর বনাঞ্চলে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঘ, চিতাবাঘ প্রভৃতি বিপজ্জনক বন্যপ্রাণীর অপর্যাপ্ত অস্তিত্ব ছিল। হিংস্র বন্যপশুর আক্রমণে মানুষ ও গৃহপালিত পশুর জীবনহানি সমসাময়িককালে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা

ছিল এবং উপক্রুত এলাকার প্রজাকুলের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ও ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্ব রাজপরিবারকে সব সময়েই নিতে হোত। প্রয়োজন-ভিত্তিক নিরাপত্তামূলক শিকার ও সৌখীন শিকার প্রাচুর্যের মধ্যেও বন্য-পশুর সংখ্যার হেরফের হয়নি কখনও সেদিন।

কিন্তু দিন আজ পাল্টেছে। কৃষি, শিল্প ও মনুষ্য বসতি সম্প্রসারণের প্রয়োজনে বনাঞ্চল শেষ হতে চলেছে—যার অনিবার্য ফলস্বরূপ বনহারা বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে দ্রুতক্ষয়িষ্ণু। এর ওপর দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীদের অর্থানুকুল্যে চোরা-শিকারীদের বেপরোয়া দৌরাত্ম্য দেশের মূল্যবান প্রাণী সম্পদ নিশ্চিত অবলুপ্তির দ্বারে এসে পৌঁছেছে।

উপরোক্ত অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই দরকার। লালজী আজ তাই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের একজন নিষ্ঠাবান ও সক্রিয় সমর্থক। তিনি কলকাতায় অবস্থিত পূর্বভারত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সমিতির সভ্য। আসাম সরকারের বন্য-প্রাণী উপদেষ্টা পর্ষদেরও তিনি অন্যতম সদস্য। তাঁর মতামতকে আসামের রাজ্য-সরকার যথেষ্টই গুরুত্ব দেন। পূর্বাঞ্চলীয় বন্য-প্রাণী পরিস্থিতি সম্বন্ধে লালজীর মতামতকে আমরাও কম গুরুত্ব দিই না।

সদা ফূর্তিবাজ, নিরহঙ্কার, বন্ধুবৎসল লালজীর সংস্পর্শে দেশী-বিদেশী যে আসে সেই আপন হয়—মুগ্ধ হয়। তাঁর গুণগ্রাহীর সংখ্যাও প্রচুর। কিন্তু তিনি সর্বপ্রকারের চটকদারী প্রচার মাধ্যমকে এড়িয়ে তাঁর সখের আরণ্যক জীবনের পরম আত্মতৃপ্তির মধ্যে চিরদিন মশগুল হয়েই রইলেন।

তাই না বলে পারি না—লালজীর বন্ধুত্বে সৌভাগ্যবান হয়েও তাঁর জীবন আমার কাছে আজও এক মহা বিস্ময়।

পাঠকমহলকে আমি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিচিতির একঘেয়েমির মধ্যে আর আবদ্ধ করে রাখতে চাইনে। চাইনে বলেই লালজীদের কিছু দুঃসাহসিক শিকার কাহিনীর পরিবেশনার মাধ্যমে

তাদেরকে আবার আসাম অরণ্যের লোমহর্ষক রোমাঞ্চের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে চাই।

লোমহর্ষক লড়াই

শীতের সন্ধ্যা। কুয়াশাভরা অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। হাতী নিয়ে ঝোপগুলো একটু ঢুঁড়ে দেখবার জন্য এগুতেই আচমকা প্রচণ্ড গর্জনে বাঘ আক্রমন করে বসলো। চারিদিকে লোকালয়। বাঘের প্রাণ কাঁপানো গর্জনে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা ভয়ে দিশেহারা হয়ে ঘরের চালের ওপর উঠে পড়লো। গৃহপালিত গরুমোষগুলি গোয়ালের দরজা ভেঙ্গে পালাবার জন্যে ঠেলাঠেলি সুরু করে দিলে। আগাছার আড়ালে কিছু দেখা না গেলেও গর্জনের শব্দ ধরে নির্দিষ্ট নিশানায় শিকারীরা গুলিও করেছিলেন। না করে উপায়ও ছিলনা। কিন্তু ফলাফল বোঝা গেলনা। অন্ধকারে বাঘ ছুটে নালাটার দিকে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অগত্যা অভিযান সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে শিকারীরা ক্যাম্পে ফিরে গেলেন।

১৯৫৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী। লালজীর নেতৃত্বে গোয়ালপাড়া জেলার কচুগাঁও ফরেষ্ট ডিভিশনে শিকার ক্যাম্প পড়েছে সেবার।

ক্যাম্পে পৌঁছে গুছিয়ে বসতে না বসতেই দুপুর নাগাদ খবর এলো সেরফাংগুড়ি গ্রামে গত রাতে বাঘে গরু মেরেছে। স্থানটি বন থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে গ্রামাঞ্চলের মধ্যেই। এরূপ স্থানে ডোরাকাটা বাঘ আসতে পারে বলে বিশ্বাস হয়না। নিশ্চয়ই ওটা লেপার্ড (চিতাবাঘ)। লেপার্ড হোক আর যাই হোক, খবর পেয়েই শিকারীরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ' অগত্যা সময় নষ্ট না করে লালজীও দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

লেপার্ড বলে সঙ্গে রইল বন্দুক। শুধু মুনীন্দ্রের হাতে একটি ছোট রাইফেল।

হাতীর মধ্যে রইল কুমার, শঙ্করপ্রসাদ, গণেশ, প্রতাপসিং, শিবাণী

ও তারারাণী। শিকারী ও সহযাত্রীদের মধ্যে রইলেন লালজী স্বয়ং, সন্তোষকুমার বড়ুয়া (ছোট ভগ্নিপোত) মুণীন্দ্র (বড় ভাগ্নে), ছোট বোন নীলিমা ও তাঁর জা উত্তরা বড়ুয়া, এবং মাসতুতো বোন অম্বুজা চৌধুরী। হাতী আগে রওনা হয়ে গেল। শিকারীরা গেলেন পরে জিপে। পৌঁছুতে বিকেল হয়ে গেল।

রাতে গরুগুলো সব গ্রামের মধ্যে ছাড়া ছিল (সকালে গুনতিতে একটা গরু কম পড়লেপর খোঁজাখুঁজি সুরু হয়। রক্তের চিহ্ন ও টানা দাগ দেখে বোঝা গেল বাঘে মেরেছে। মড়ি টেনে নিয়ে বাঘ ঢুকেছে গিয়ে গ্রামের মাঝেই একটা নালার নল খাগড়ার জঙ্গলে।

সতর্ক পর্যবেক্ষণে ধরা পড়লো লেপার্ড নয়—ডোরাকাটা বাঘই। নল খাগড়ার জঙ্গলটা দুই ফার্লং মত লম্বা এবং একশো গজের মত চওড়া। জঙ্গলের পশ্চিমে একটা নদী। নাম সাপকাটা। উপরোক্ত নালাটা নদীরই গতিপথ ছিল হয়ত কখনও। এখন প্রায় শুকনো। অল্প জল আছে মাঝের দিকে।

জঙ্গল ফালিটার চারিদিকেই গ্রাম। বাঘের পালাবার পথ নেই। কাজেই লালজীর নির্দেশে সব হাতী একই লাইনে জঙ্গল মাড়িয়ে এগিয়ে গেল। কিছুদূর যাবার পর জঙ্গলে জানোয়ার চলার হালি (আলোড়ন) দেখা গেল। বিটিং লাইন জঙ্গল চেপে শেষ মাথায় এসে পড়লে পর বাঘ কোনঠাসা হয়ে পড়লো। শটগানে বাঘের ওপর গুলি ছোঁড়ায় দ্বিধা ছিল। বাঘও সেই সুযোগে উপায়ান্তর না দেখে এ জঙ্গলের আড়ালের আশা ত্যাগ করে ছুটে গিয়ে জলে নেমে নদী সাঁতরে ওপারে চলে গেল। শিকারীরাও হাতীর পিঠে চেপে নদী পেরিয়ে বাঘকে অনুসরন করে গেলেন।

পায়ের দাগে প্রমান হোল বাঘ ওপারে প্রায় আধ মাইল দূরে গ্রামের মধ্যে একটা গৃহস্থ বাড়ীর পেছনে লতা ঝোপে ঠাসা বাঁশ বনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। একদিকে গ্রামবাসীদের এত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তাড়া খাওয়া বাঘকে বসিয়ে রেখে যাওয়া যেমন বিপজ্জনক

অন্যদিকে সেইরূপ তার চাইতে বেশী বিপজ্জনক হচ্ছে চারিদিকের মানুষজনের মধ্যে একটা পলায়নপর বাঘের দৌড়ঝাপের পেছনে বেপরোয়া বন্দুক চালাচালি করা। পরিস্থিতিটা লালজীকে একটু ভাবিয়ে তুললো।

মনে একটু জেদও চেপেছে। লালজী নির্দেশ দিলেন হাতী দিয়ে জঙ্গলটাকে মাত্র পুবদিকটা খোলা রেখে অন্য তিন দিক দিয়ে অর্দ্ধ বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলতে এবং ধীরে খেদিয়ে সামনে এগুতে।

লালজী নিজে আছেন নিজের প্রিয় ও বিশ্বস্ত বাহন প্রতাপসিং এর পিঠে। নিজের হাতের নিশানার ওপর অগাধ বিশ্বাস তাঁর। এরূপ ছোট জঙ্গল খণ্ডের মাঝে বাঘতো নজরে পড়বেই। কাজেই গুলি তিনি নিজেই ছুঁড়বেন। অন্যান্যদের সতর্ক করে জানিয়ে দিলেন—নেহাৎ আক্রান্ত না হলে যেন কেউ হাতিয়ার না চালায়।

লালজীর মতলবটা হোল নিজের গুলিতে ধরাশায়ী হয়তো ভালই। নইলে পালিয়ে গেলে বাঘ পুনরায় তার আগের জঙ্গলেই ফিরে যাক।

লালজীর বিলক্ষণ জানা আছে শিকার সংক্রান্ত তামাসা দেখবার জন্য অজ্ঞ ও হুজুগে গ্রামবাসীদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। কাজেই তাঁর দুশ্চিন্তা হোল আলোচ্য ক্ষেত্রে লোকালয়ের গা ঘেঁসা বাঁশ বনে একাধিক শিকারীর হাত থেকে এলোপাতাড়ি গুলি হলে পর আত্মরক্ষাব সহজাত তাগিদে বাঘ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘন বসতির অলি গলির মধ্যে গিয়ে হয়ত ঢুকতে পারে। পূর্বোক্ত কারনে সেটা হবে আরো বিপজ্জনক।

ঠাসা বাঁশবন সুষ্ঠুভাবে বিট করাও কঠিন। বিটিং লাইনে লালজী গ্রামের দিকটাই আগলে এগুচ্ছিলেন। সন্ত্রস্ত বাঘ। একটু তাড়া খেলেই অস্থির হয়ে উঠবে। অসুবিধাজনক ঘেরের মধ্যে তার দিক থেকে প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণও অসম্ভব নয়। লালজী

নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন। চোখ তাঁর সামনের জঙ্গলের প্রতিটি গলি ঘুজি তন্ন তন্ন করে খুঁজছে।

সামনে কিছুটা দূরে লতায় ঘেরা একটা ঠাসা ঝোপ। ঐ ঝোপটার ওপর লালজী নজর রাখছিলেন। কারণ ঘাপটি মেরে থাকার পক্ষে ঐ ঝোপটা বাঘের কাছে অধিক আকর্ষণীয় বলে তাঁর মনে হয়েছে। ঝোপের মধ্য থেকে কয়েকটি সরু জংলী গাছের ডগা উপরের লতাপাতার আচ্ছাদন ফুঁড়ে শূন্যে মাথা জাগিয়ে ছিল।

বিটিং লাইন হল্লা করে এগুচ্ছে। হাতীর পিঠে নিজের শরীর ছুলছে। সেই দোলনের মধ্যে লালজী লক্ষ্য করলেন উপরোক্ত গাছের ডগাগুলিও যেন হঠাৎ একটু দুলে উঠলো। মানে? মানে ঝোপের নীচে হয়ত কোন জানোয়ার নড়াচড়া করেছে। জানোয়ার বলতে গ্রামের এত নিকটে তাড়া খাওয়া বাঘটা ছাড়া আর কিইবা হতে পারে? লালজীর কৌতূহলী দৃষ্টিটা স্থিরবদ্ধ রইল ঝোপটার ওপর।

বিটিং লাইনের এই বাহুর প্রথমেই ছিল লালজীর হাতী। চট করে চোখ ঘুরিয়ে পেছনের হাতী কতদূর দেখে নিয়েই লালজী পরক্ষণেই আবার তাকালেন ঝোপটার দিকে। কি আশ্চর্য্য! ঝোপের গাছগুলোর ডগা এবার বেশ জোরেই নড়ছে এবং সেই নড়নটা ক্রমেই পূব দিকে এগুচ্ছে। অভিজ্ঞ লালজী বুঝলেন এতো বাঘের হালি ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

ঝোপের বাইরেও ঠাসা আগাছার জঙ্গল। হালি এবার পৌঁছেছে গিয়ে ঝোপের লাগোয়া আগাছার জঙ্গলে। গতিটা তার ক্রমেই বাড়ছে। মানে বাঘের ভয় বাড়ছে। লালজী তাঁর বন্দুক রেখেছেন হালির নিরিখে। বাঘের হালি হলেও আগাছার আড়ালে বাঘকে দেখা যাচ্ছেনা। ফলে গুলি করাও মুস্কিল। বাঘের গতিমুখ বরাবর সামনের জঙ্গলটা লালজী চট করে একবার চোখ চালিয়ে দেখে নিলেন। গজ পনেরো সামনে জঙ্গলে অপেক্ষাকৃত হালকা

একটু অংশ আছে যে অংশটা পেরোবার সময় বাঘের শরীরটা শিকারীর নিশ্চয়ই নজরে আসবে। কিন্তু হাতী প্রতাপসিং যেভাবে এগুচ্ছে তাতে নির্দিষ্ট সময়ে দূরত্বের বিচারে স্থানটা হয়ত বন্দুকের পাল্লার বাইরেই থেকে যাবে।

লালজী মাহুতকে ইসারা করলেন বাঘের হালির সমান্তরালে হাতীর গতিবেগটা একটু বাড়াতে। বাড়ানোর অন্য একটা কারণও ছিল। শিকারী চাইছিলেন বাঘকে পাশ থেকে পাষড়ে গুলি করতে। বন্দুকের গুলিতে জায়গায় ফেলতে না পারলেও নির্ভুল নিশানায় লাগলে পর আঘাতটা মারাত্মক হওয়াও অসম্ভব নয়।

মাহুত লালজীর নির্দেশমত প্রতাপসিংকে এগিয়ে নিয়ে গেল ঠিকই। কিন্তু বলা বাহুল্য হাকা (বিট, জঙ্গল খেদানো) কখনও নিঃশব্দে হয়না। এবং জঙ্গল ঠেলে হাতীর মত বিশাল-দেহ প্রাণীর দ্রুত পদচালনাও বাঘের মত প্রখর দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন সতর্ক প্রাণীর কাছেও অজ্ঞাত থাকে না। তাই হয়ত পেছনে জঙ্গল ছুটোপাটির সাড়া পেয়ে সন্ত্রস্ত বাঘও তার চলার বেগ আরও বাড়িয়ে দিলে।

লালজী তাঁর বন্দুক স্থিরবদ্ধ রেখেছেন বাঘের হালি বরাবর। ট্রিগারে তাঁর আঙ্গুলের স্পর্শ ঠেকানো আছে বাঘের পূর্বোক্ত ফাঁকা স্থানটায় পৌঁছনোর অপেক্ষায়। কিন্তু বাঘের পা চালানোর রোখটা যেন ক্রমেই বাড়ছে। তা বাড়ুক। লালজী তবুও সুযোগটা নিতে চান! ফাঁকা স্থানটা আর মাত্র দু'চার গজের মাথায়।

লোকালয়ের মধ্যে যে সব বাঘ শিকার-সফরে আসার সাহস রাখে তারা বেশ চতুরই হয়। এ বাঘটাও চতুর। তাই তার চলার পথের ঐ ফাঁকা ফালিটা সে পায়ে হেঁটে না পেরিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে গেল। বাঘের এই চাতুরীর জন্য লালজী ঠিক আগে থেকে তৈরী ছিলেন না। অনিশ্চিয়তার মধ্যেও আচমকা অভ্যস্ত হাতে তিনি গুলি চালালেন।

বন্দুকের শব্দের পিঠ পিঠ গাঁক করে একটি ডাক ছেড়ে আতঙ্কিত বাঘ হুড়মুড় করে বাঁশবন পেরিয়ে মাঠে পৌঁছে ঝাঁপদৌড়ে ছুটতে ছুটতে পুবে সাপকাটা নদীর দিকে পালিয়ে গেল। গুলিতে সে আহত হোল কিনা বোঝা গেলনা। বোঝা না গেলেও তার ডাকের অর্থটা একেবারে নিরর্থক কিছুর অভিব্যক্তি বলেও মনে হোলনা।

এখনও দিনের আলো কিছুটা আছে। কাজেই জোর পায়ে হাতী চালিয়ে সাপকাটা নদী পাড়ি দিয়ে শিকারীরা আবার সেই নালার জঙ্গলের মুখে এসে পৌঁছুলেন। বাঘ আবার এসে ঢুকেছে এই জঙ্গলে। এবার প্রথম বিটের উল্টো—অর্থাৎ নদীর দিক থেকে বিট সরু হোল। দুই ফার্লং লম্বা নল খাগড়ায় ভরা নালার পুরো জঙ্গলটা হাতীর পায়ের তলায় দলে বিটিং লাইন সোজা এগিয়ে উল্টোদিকের শেষ মাথায় পৌঁছে গেল। তবুও বাঘের কোন পাত্তা নেই। খুবই রহস্যজনক ব্যাপার। চারিদিকে গ্রাম ও ফাঁকা ক্ষেত খামার। বাঘ যাবে কোথায়?

বাঘ যায়নি কোথাও। নিশ্চয়ই নালার কিনারা ঘেসা কোন ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে ঘাপটি মেরে আছে। শিকারীরা আবার ফিরে এলেন নালার পশ্চিম মাথায়। সাপকাটা নদীর কূলের নরম মাটিতে নজর করে দেখা গেল বাঘ-যে নদী সাঁতরে এপারে পৌঁছে নালার দিকেই এগিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। নদীর চরে তার টাটকা পায়ের ছাপ। তা হলে?

লালজী লক্ষ্য করে দেখলেন বিট সুরু করতে ওঁরা যেখান দিয়ে নল খাগড়ার জঙ্গলে নেমেছিলেন, নালার সেই মুখের বাঁ দিকের ঢালুতে কয়েকটি বন-কুলের ঝোঁপ আছে। সে ঝোপগুলো আগে খেদানো হয়নি। বাঘের গা ঢাকা দেবার মত আর কোন জায়গা যখন নজরে আসছেনা তখন ঐ ঝোপগুলো আর বাদ থাকে কেন? একবার দেখলেই হয়।

অন্য হাতীগুলোকে ফাঁকায় দাঁড় করিয়ে রেখে লালজী ভাগ্নে মুনীন্দ্রসহ দুটো হাতী নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আবছা অন্ধকারে সব কিছু পরিষ্কার নজরে আসেনা। ঝোপ ক'টার তল্লাসী সেরেই ক্যাম্পে ফিরতে হবে। আজ আর খোঁজাখুঁজির সময় হবে না।

লালজীর হাতি প্রতাপসিং। মুণীন্দ্রের হাতী গনেশ। দু'জনে পাশাপাশি এগুচ্ছেন। নল খাগড়ার ঘন জঙ্গল ছেড়ে বাঘ যে ঐরূপ হালকা বনকুলের ঝোপে আশ্রয় নিতে পারে শিকারীদের এতটা প্রত্যাশা ছিলনা। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতিটা অন্যরকমই হোল।

হাতীর পিঠে বসেই দেখা যাচ্ছে গ্রামের সব বয়সের বাসিন্দারা জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে পাড়ার গলি ঘুজির মুখে। অতি উৎসাহী কয়েকটা যুবক যেন নিজেদের সাহস জাহির করবার জন্যে লোকালয় ছেড়ে এগিয়ে এসে একেবারে মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। নির্বোধরা বোঝেনা—তাড়া খাওয়া বদরাগী বাঘের হাতে এদেরই ঘায়েল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশী। দেখে শুনে লালজীর প্রায় বিশ বছর আগেকার ১৯৩৩ সালের এপ্রিলের একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো।

সেবারের ক্যাম্প পড়েছিল দুলানী নদীর তীরে বিজনীতে। ঘটনার দিন সকাল থেকে দুপুরের পর পর্যন্ত এক নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টার লোমহর্ষক পরিস্থিতির মধ্যে ভেটাগাঁওয়ের পীরের ভিটার জঙ্গলে বড় রাজকুমারী নীহারবালা বড়ুয়ার ডোরাকাটা বাঘের বহুনি শিকার সবে শেষ হয়েছে। শিকারীরা খুসী মনে ক্যাম্প থেকে পাঠানো খাবারের সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত। সদ্য সমাপ্ত ঘটনার গুলজার চলছে একই সঙ্গে। এমন সময় খবর এলো প্রায় দু'মাইল দূরে লটিবাড়ী নামক স্থানে বাঘে গরু মেরেছে। আবার একটা জ্যান্ত বাঘের কথা কানে আসতেই খাবারের প্লেট হাতে শিকারীরা একটু নড়ে চড়ে বসলেন। বড় রাজকুমারীর সফল শিকারের পর সবার

মেজাজ বেশ চড়া ছিল! তাই লটিবাড়ীর বাঘের পেছনে যাবার অনুকূলে সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হোলনা।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছুতে প্রায় সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। সংবাদ-বাহকটি শিকারীদের যে জঙ্গলের কথা বলেছিল—সময়ের অভাবে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়াই তাড়াতাড়ি করে কয়েকবার সেই জঙ্গলটা খেদানো হোল। কিন্তু বাঘ বা মড়ির কোন হদিসই পাওয়া গেল না।

লোকালয়ের সংলগ্ন দুলানী নদীর কয়েকটি সঙ্কীর্ণ প্রশাখার জলধারায় বিভক্ত বিক্ষিপ্ত কিছু জঙ্গল সমষ্টি নিয়ে গঠিত আলোচ্য এলাকাটি। মাঠের মধ্য দিয়ে গ্রামে যাওয়া আসার একটি রাস্তা।

শিকারীদের আগমনে গ্রামে চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছে। বাঘ-শিকারের তামাসাটা দু'চোখ ভরে একটু এগিয়েই দেখা দরকার। সে দেখায় বাদ বিচার মানছে কে? আর তা মানাবার জন্য গ্রামের মোড়লদের খুব মাথাব্যথাও নেই। নেই বলেই আগে ভাগে দু'একপা করে এগিয়ে এসে রাস্তার মাঝে তারাই হয়েছেন প্রথম সারির দর্শক। সে সারির পেছনে পাড়ার যুবদের ভিড়। কৌতুককর কিছু একটা ঘটছে বা ঘটবে। শিশুদেরও তাই সামলান যায়নি। অগত্যা গ্রামের ঠাকুমা দিদিমারা তাদের অবাধ্য শিশু নাতি নাতনীদের কোলে কাঁখে নিয়ে যুব সমাবেশের পেছনে এসে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছেন। ঘর গৃহস্থালীর সান্ধ্য কাজকর্ম আপাতত ফেলে রেখে কৌতূহলী গৃহিনীরাও একে একে এসে হাজির। অর্থাৎ দর্শক সমাবেশটা যেন শেষ পর্যন্ত পল্লীর আবাল বৃদ্ধ বনিতার নীরব ও নিশ্চল জমাট মিছিলের রূপ নিল।

এলোপাতাড়ি জঙ্গল খেদিয়ে বাঘ না পেয়ে শিকারীদের হুস হোল—"তাইতো, এভাবে আন্দাজে জঙ্গল না হাতড়ে বাঘের শিকার টেনে নিয়ে যাবার দাগটা অনুসরণ করলেই হয়।

তাই করে দেখা গেল বাঘ মড়ি .নিয়ে একপাশের বিক্ষিপ্ত এক জলকাদায় ভরা জঙ্গলে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাতীর দল নেমে গেল বিটিংএ।

বিটিং শেষ হয়ে আসছে—বাঘের দেখা নেই। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। শিকারীরা হতাশ হচ্ছেন। ওদিকে রাস্তার দর্শককুল অধৈর্য্য হয়ে একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে হালকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, এবং শিশুরা মাটিতে আরাম করে বেশ জেঁকে বসে পড়েছে।

বিটিং লাইন ইতিমধ্যে প্রায় জঙ্গলের শেষ মাথায় পেঁৗছে গিয়েছে। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড বাঘ গগন-বিদারি গর্জনে সবাইকে চমকে দিয়ে লাফিয়ে উঠে মাঠে গিয়ে পড়লো এবং ছুট দিল লোকালয়ের দিকে।

কি সর্বনাশ, বাঘ। মুহূর্ত মধ্যে রাস্তার দর্শক সমাবেশ ভয়ার্ত্ত চীৎকারে ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক ছুটতে আরম্ভ করলো। কোন্ দিকে কার বাড়ী সে খেয়াল নেই। পালানোই তখন প্রথম কাজ। প্রত্যেকের ভয় বাঘ বুঝি তারই ঘাড়ে এসে পড়ে।

বাঘও জঙ্গল থেকে তাড়া খেয়ে গজরাতে গজরাতে মাঠে নেমে ছুটেছিল যেদিকে দু'চোখ যায়। ঝোঁকের মাথায় একরোখে সামনে এগিয়েই সে দেখে ওদিকে জঙ্গল নেই গ্রাম, এবং চারিদিকে ছুটন্ত মানুষের ছুটোপাটি আর আর্তনাদ। বাঘের গর্জন ও বিহ্বল দর্শক দঙ্গলের আর্তনাদ সব মিলে মিশে চষা ক্ষেত্রের মাঝে যেন এক হুলুস্থুল কাণ্ড সুরু হয়ে গেল।

শিকারীরা ততক্ষণে জঙ্গল ছেড়ে বাইরে এসে কাণ্ডকারখানা দেখেতো হতবাক। গুলিভরা বন্দুক রাইফেল হাতেই ধরা। কিছুই করার নেই। চারিদিকে মানুষ ছুটাছুটি করছে। বুড়োরা দু'একজন ছুটতে গিয়ে বেমোড়ে পা মচকে ক্ষেতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। কোন ঠাকুমা শুধু তার নাতনীকে নিয়েই পালিয়েছেন। শিশু নাতিটি

অসহায়ভাবে পথের ধুলোয় বসে কেঁদে গলা ফাটাচ্ছে। ওদিকে গ্রামে যারা আগে ভাগে পৌঁছুতে পেরেছে তারা যার যার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়েছে। যারা পরে পৌঁছেছে তাদের কেউবা বন্ধ ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দাপাদাপি করছে। কেউবা কচুবন, কলাবনের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে। বয়স্ক পুরুষদের অনেকেই ঘরের চালের নিরাপদ মটকায় উঠে গিয়েছে। যুবক যারা সাঁতার জানে তারা মরিয়া হয়ে পাড়ার পুকুরের ডুবজলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

বাঘের গর্জন কানে যাওয়ায় গ্রামের কুকুরগুলো ভয় পেয়ে ল্যাজ গুটিয়ে জোট বেঁধে কোরাসে চেঁচাচ্ছে। গোয়ালের গরুগুলো হাইফাই করছে চরম আতঙ্কে।

বিহ্বল বাঘ ক্ষেত খামারের মধ্যে দু'চার চক্কর দিয়ে বুঝে নিলে এদিকে গা ঢাকা দেবার মত কোন স্থান নেই। ভয় বাড়লো। ফিরে চললো যে পথে এসেছে সেই পথ ধরে। সামনে তাকিয়ে দেখে দূরে জঙ্গলের প্রবেশ মুখ আগলে দাঁড়িয়ে আছে শিকারী হাতীর দল। আরো ঘাবড়ে গিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিতে গিয়ে একটু ঢালু জমিনে সামনে পড়ে গেল দিশেহারা এক গ্রাম্য বালক। হাতীর পিঠ থেকে শিকারীরা আঁতকে উঠলেন—"হায়রে, বেচারা মরলো বুঝি বাঘের থাবায়।" না মরেনি। বাঘ থাবাও মারেনি। প্রচণ্ড গতিবেগের ঝোঁক সামলাতে না পেরে বাঘ শুধু একটা দীর্ঘ লাফে শূন্যভরে ছেলেটির মাথার ওপর দিয়ে টপকে নক্ষত্র বেগে একটু ঘুরপথে ছুটে গিয়ে ঢুকলো আগের জঙ্গলে। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে জঙ্গলে হারিয়ে গেল—আর কোন হদিস মিললো না তার।

পূর্বস্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে লালজী বোধহয় একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিলেন। মুণীন্দ্রের হাতী ধীর পায়ে একসঙ্গে পাশাপাশি এগুচ্ছে। বনকুলের ঝোপের কাছে যেতেই বিকট গর্জনে বাঘ চার্জ করে বসলো। সে গর্জনের গুরু গম্ভীর ধমক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোল চারিদিকে, দূর থেকে দূরান্তরে।

লোকালয়ের দিকে আতঙ্কের সোরগোল পড়ে গেল। গ্রামবাসীদের ভয় বাঘ বুঝি তেড়ে আসছে তাদের দিকেই। কৌতূহলী যারা বাইরে ফাঁকায় ছিল তারা ছুটে গিয়ে ঘরের চালে আশ্রয় নিলে। বাড়ীর মহিলারা ছেলেপুলেদের ডেকেডুকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। চারিদিকে দৌড় ঝাঁপ, দরজা, জানালা বন্ধের শব্দ।

ফাঁকার চাইতে ঝোপ জঙ্গলের দিকে সান্ধ্য ঘোরটা একটু বেশী। দুই হাতীর সামনে ক্ষিপ্ত বাঘের আক্রমণ ঘটলো তড়িৎ গতি দ্বিমুখী ঝোঁকে। এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে দু'জনেই গুলি করিলেন। গুলি লাগল কিনা বোঝা গেলনা। বাঘ আবছা অন্ধকারে দুই হাতীর মাঝ দিয়ে চোখের পলকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। রোখা সম্ভব হোলনা। জঙ্গলে চোখ চলেনা। এ অবস্থায় আবার বাঘের পেছনে ধাওয়া করা বৃথা। বাধ্য হয়ে সেদিনের চেষ্টা স্থগিত রেখে শিকারীরা ক্যাম্প ফিরে এলেন।

পরদিন সকাল ন'টা নাগাদ শিকার পার্টি আবার পৌছে গেলেন আগের দিনের ঘটনাস্থলে। গুলি হবার পর বাঘ ঢুকেছিল নালার মধ্যে নল খাগড়ার ঠাসা জঙ্গলে। তাই গুলিতে বাঘ আহত হয়েছিল কিনা এবং রক্তপাত ঘটেছিল কিনা দেখা সম্ভব হোল না। জঙ্গল ফালিটার চারিদিকের জমিন পর্যবেক্ষণ করে এমন কোন চিহ্ন পাওয়া গেলনা যাতে প্রমাণ হয় বাঘ রাতে জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। কাজেই লালজীর পরামর্শ অনুযায়ী নালাটা বিট করাই সাব্যস্ত হোল।

পার্টিতে আজ গতকালের দুই আত্মীয়া মহিলা আসেননি। হস্তিনী তারারাণীর পিঠে লালজীর ছোট বোন নীলিমা সুন্দরী ও তাঁর স্বামী সন্তোষবাবু। গণেশের পিঠে মুণীন্দ্র! লালজী তাঁর নিজস্ব বাহন প্রতাপসিংহ। দলে আরো তিনটি হাতী রইল। নাম —কুমার, শঙ্করপ্রসাদ ও শিবানী। লালজী ও সন্তোষবাবুর হাতে শটগান। মুনীন্দ্রের হাতে ভারী রাইফেল।

নালার পূব দিক থেকে বিট আরম্ভ হোল। নল খাগড়ার জঙ্গল মাড়িয়ে বিটিং লাইন নালার প্রায় তিন চতুর্থাংশ অতিক্রম করে গিয়েছে। তখনও বাঘের কোন সাড়া নেই। বিট এগুচ্ছে পশ্চিমে। সামনে সাপকাটা নদী। বিটিং লাইনে হাতীর অবস্থান হচ্ছে, উত্তর থেকে দক্ষিণে— তারারাণী, প্রতাপসিং, শিবাণী, গণেশ, শঙ্করপ্রসাদ ও কুমার।

আরো কিছুটা এগুতেই সামনের দিক থেকে বাঘের গর্জন ভেসে এল। অনুমানে দূরত্ব প্রায় আশি গজের মত মনে হোল। অর্থাৎ বাঘের অবস্থানস্থল জঙ্গলের প্রায় শেষ মাথায়। গর্জন শুনে বিটিং লাইন একটু থমকে দাঁড়ালো। লালজী পরবর্তী ইতিকর্তব্য ঠিক করে নিলেন।

নালার দক্ষিণ পাড়টা খাড়া। উত্তর পাড় ঢালু। লালজীর নির্দেশে কুমার হাতী উঠে গেল দক্ষিণ পাড়ে এবং তারারাণী উঠলো উত্তর পাড়ে। ওদের পীঠের শোয়ারীরা উপর থেকে পাশাপাশি চলতে চলতে নালার ভিতর বাঘ চলাচলের দিকে নজর রাখবে। লাইনের বাকী চার হাতী এবার আস্তে আস্তে আরো বিশ গজ এগুলো। আবার বাঘের গর্জন হোল। লাইন থমকে দাঁড়ালো। লালজী হুকুম দিলেন হাতী দিয়ে মাড়িয়ে নল খাগড়া মাটিতে মিশিয়ে জঙ্গল ফাঁকা করে ফেলতে। করাও হোল হুকুমমত। যতক্ষণ এ কাজ চললো—বাঘ চুপ করে রইল।

লাইন আবার বিশ গজ এগুলো। আবারও বাঘ হুমকি দিলে। হাতীর লাইন আবার থেমে জঙ্গল ফাঁকা করে ফেললে। বাঘ এবার আরো দু'এক কিস্তি বাড়তি হম্বি তম্বি করলে। হাবভাবে মনে হচ্ছে বাঘ নিছক ভয় দেখাচ্ছে। তার একই স্থানে বসে হুমকি দেবার কারণ এই হতে পারে যে সে আহত, অথবা, এদিকে ফাঁকায় বেরিয়ে পালাতে সাহস পাচ্ছে না। বিটিং লাইন এগিয়ে আসাতে তাই সে ঘেরে পড়ে গিয়েছে। কাজেই এ অবস্থায় যে কোন সময় প্রতি আক্রমণ ঘটতে পারে।

জঙ্গল দাবিয়ে ফাঁকা করতে করতে লাইন আরো প্রায় গজ দশেক এগুলো। এবার উত্তেজিত বাঘ মাঝে মাঝে হুমকি দিয়ে সমানে গজরাতে সুরু করলো। লাইন যতটুকুই এগুচ্ছে ততটুকুই সমানে হাতীর পায়ে পিষে জঙ্গল ফাঁকা করে ফেলছে। জঙ্গলের ঘের ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে।

হম্বি তম্বিতে বোঝা যাচ্ছে বাঘ প্রায় পঁচিশ ত্রিশ গজের মাথায়। হাতীগুলো সব চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

হাতী শঙ্করপ্রসাদের মাহুত জাফর সেখ। একটু বেশীই এগিয়ে পড়েছিল তার হাতী। মুনীন্দ্র তাকে সাবধান করলো। কিন্তু তবু জাফরের হাতী প্রায় গজ দশেক এগিয়ে গেল। উত্তেজিত হাতীকে হয়ত জাফর সামলাতে পারেনি। বাঘ এতে প্ররোচিত হয়ে গাঁক গাঁক করে ডাক ছেড়ে ছুটে জাফরের হাতী শঙ্করপ্রসাদের পা কামড়ে ধরলে। এই অবস্থা দেখে চরম আতঙ্কে একমাত্র লালজীর হাতী প্রতাপসিং ছাড়া অন্য সব হাতীই জঙ্গল ছেড়ে পালিয়ে গেল।

শঙ্করপ্রসাদ ছিল অতি শক্তিশালী দাঁতাল হাতী। পায়ের ঝটকা মেরে সে প্রথমে বাঘের কামড় ছাড়াবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। তখন দাঁত দিয়ে বাঘকে মাটিতে চেপে ধরবার চেষ্টা করলে। নল খাগড়ার বনে ওদিকে কি হচ্ছে কিছু বোঝা যাচ্ছেনা। শুধু বাঘের গর্জন ও বাঘ-হাতীর হুটোপাটির শব্দ কানে আসছে।

অতীতে বাঘে-মানুষের বহু লোমর্ষক লড়াইয়ের সক্রিয় অংশীদার হচ্ছে লালজীর হাতী প্রতাপসিং। প্রতাপসিং জঙ্গল ঠেলে ছুটে গেল শঙ্করপ্রসাদের সাহায্যে। আশা হয়েছিল শঙ্করপ্রসাদ হয়ত ইতিমধ্যে তার দাঁতের চাপে বাঘকে ঘায়েল করতে পেরেছে। কিন্তু মাথা তুলতেই দেখা গেল বাঘ পায়ের কামড় ছেড়ে দিয়ে শঙ্কর-প্রসাদের ডান চোখের উপরে কামড়ে ধরে ডান থাবার তীক্ষ্ণাগ্র বক্রমুখী নখে হাতীর কপাল আঁকড়ে মুখের ওপর ঝুলে আছে। আগের দিনের গুলিতে সামনের বাঁ পাটা তার ভেঙ্গে যাওয়ায় সে

পায়ে কোন জোর দিতে পারছে না। পেছনের পায়ে হাতীর দাঁত আঁকড়ে ধরে বাঘ যতবার তার গুরুভার ঝুলন্ত দেহের ভর রাখতে যাচ্ছে ততই হাতীর দাঁতে লেগে পা তার হড়কে যাচ্ছে। শঙ্করপ্রসাদ বাঘের যন্ত্রণাদায়ক সংস্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য জঙ্গলে দাপাদাপি করছে আর সমানে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। কিন্তু বাঘ নাছোড়বান্দা। শরীরটা তার হাতীর মুখের সামনে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলছে। তবুও কিছুতেই সে তাব বজ্রকামড় ছাড়ছে না।

মাহুত জাফর শেখ প্রাণ ভয়ে চেঁচাচ্ছে—'শিগগির গুলি করুন। আমাকে খেলো। আমাকে খেলো'। জাফরের ঝোলানো পাদুটো হাতীর দু'কানের পেছন দিক দিয়ে দড়ির দুলশিতে আটকানো। বাঘ এক একবাব ঝট্‌কা মারছে সামনের ডান থাবা এগিয়ে নিয়ে মাহুতের বাঁ পাটা আঁকড়ে ধরতে। কিন্তু ঝুলন্ত দেহ নিয়ে অন্য কোন পায়ে একটুও ভর রাখতে না পারায় তা সম্ভব হচ্ছে না।

নির্ভীক হাতী প্রতাপসিং লালজীকে নিয়ে ইতিমধ্যেই পেঁছে গিয়েছে। অন্যান্য হাতীরা পালিয়েছে। মাহুতরা তাদের কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারছে না ঘটনাস্থলে। পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ ও জরুরী। লালজী গুলিভরা বন্দুক হাতে অসীম উদ্বেগে অসহায়-ভাবে বসে আছেন প্রতাপসিং এর পিঠে। বাঘকে গুলি করে মাটিতে ফেলতে না পারলে জাফর সেখের জীবন সংশয়ের সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু উত্তেজিত শঙ্করপ্রসাদ বিহ্বল অবস্থায় যেভাবে ছটফট করছে তাতে লালজী গুলি ছুঁড়লে হাতী ও মাহুত দুজনেই আহত হতে পারে। কিন্তু বাঘ মরিয়া হয়ে যেভাবে হাতীর মুখে আঁকড়ে আছে ও রেগে গজরাচ্ছে, এবং জাফর আতঙ্কে আর্তনাদ করছে সাহায্যের জন্য তাতে এখুনি কিছু করা দরকার। পরিস্থিতি সত্যিই অত্যন্ত ঘোরালো।

লালজী শঙ্করপ্রসাদের চারিদিকে একবার চক্কর দিয়ে এলেন,

যদি কোন দিক দিয়ে বাঘকে গুলি করবার একটু সুযোগ পান। কিন্তু হাতীর অনবরত মাথা ঝাঁকানোর জন্যে বাঘের দোদুল্যমান দেহের নিরিখে বন্দুক স্থিরবদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে লালজীর নিজের হাতী প্রতাপসিং ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছে। এরপর সেও যদি ক্ষেপে যায়, তবে তার পিঠে বসে গুলি ছোঁড়াতো দূরের কথা তাকে সামলানোই দায় হবে। ওদিকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনির মধ্যে শঙ্করপ্রসাদের পিঠ থেকে তার মাহুত যদি ছিটকে মাটিতে পড়ে, তবে তাঁকে বাঁচানো কঠিন হবে। পরিস্থিতির জটিলতায় লালজী কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

মুণীন্দ্র সাহসী। তার হাতে শক্তিশালী রাইফেলটি। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে তার হাতী গণেশকে বাগে এনে ঘটনাস্থলে পৌঁছবার জন্য। কিন্তু নল খাগড়ার বনে আক্রান্ত হাতীর বৃংহতি-নাদ, বাঘের হুঙ্কার ও মাহুতের আর্তনাদ সব মিলে এমন একটা লোমহর্ষক বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে ভীত বিহ্বল কোন হাতীকেই আর জঙ্গলে নামানো সম্ভব হচ্ছে না। শুধু সন্তোষবাবুর হাতা তারারাণীকে তার মাহুত কোনরকমে কিছুটা এগিয়ে আনতে পেরেছিল। কিন্তু সেও ভয়ে পথিমধ্যে থমকে গিয়েছে।

এই মহা বিপজ্জনক ও জরুরী পরিস্থিতির মধ্যে প্রতিটি মুহূর্তই এখন মূল্যবান। উপস্থিত বুদ্ধিতে যা করণীয় এখনই করতে হবে। লালজী চেঁচিয়ে সন্তোষবাবুকে বন্দুক নিয়ে তৈরী থাকতে বললেন। তারপর নিজের হাতী প্রতাপসিংকে হটিয়ে এনে শঙ্করপ্রসাদের পেছন দিকে চলে গেলেন। মাহুতকে বললেন হাতীকে একটু বাঁয়ে চেপে দাঁড় করাতে। সুদক্ষ মাহুত তাই করলে। লালজী তখন বাঘকে ত্যারসাভাবে পাশ থেকে বন্দুকের নল বরাবর সামনে ফেললেন এবং বাঘের গুরুভার ঝুলন্ত দেহের টান টান করা বুকের উর্দ্ধাংশে কোনরকমে নিশানায় এনে অবিলম্বে স্থির লক্ষ্যে গুলি

করলেন। গুলির আঘাতে বাঘ আছড়ে মাটিতে পড়ে দাপাদাপি সুরু করে দিলে। বোঝা গেল আঘাত মোক্ষমই হয়েছে।

এদিকে বদমেজাজী হাতী শঙ্করপ্রসাদ বাঘের দংশন যন্ত্রণায় পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। তার কপালে গভীর ক্ষত এবং তা থেকে রক্তের ধারা শুঁড় বেয়ে নেমে আসছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। হাতী এখন প্রায় মাহুতের আয়ত্তের বাইরে। তার পাগলামিতে মাহুত জাফর সেখ ভয় পেয়ে সাহায্যের জন্য প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। মুমূর্ষু বাঘ গড়াতে গড়াতে একপাশে লালজীর দৃষ্টির বাইরে সরে গেছে। কাজেই তার ওপর দ্বিতীয় গুলির আঘাত হানা আর লালজীর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

শঙ্করপ্রসাদের পাগলামির রকম সকম দেখে লালজী চীৎকার করে জাফরকে নির্দেশ দিলেন যেভাবেই হোক আহত হাতীকে সাপকাটা নদীর জলে নিয়ে গিয়ে নামাতে। নিজেও তিনি কালবিলম্ব না করে বন্দুকে ছররা পুরে নিলেন। বলা যায়না, শঙ্করপ্রসাদের বেয়াড়াপানা যদি না কমে, ছররার গুলি ঠুকতে হতে পারে তার পাছায়।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত জাফর সেখ কোনরকমে সফল হোল হাতীকে নিয়ে গিয়ে নদীর জলে নামাতে। লালজীও তার পেছন পেছন গেলেন এবং হাতীর ক্ষতস্থান নদীর ঠাণ্ডা জলে দীর্ঘ সময় ধরে ধোয়াবার ব্যবস্থা করলেন যাতে তার যন্ত্রণার উপশম হয়। বাঘ শিকারের চাইতে তখন তাঁর কাছে পোষা হাতীর চিকিৎসার গুরুত্ব অধিক।

ওদিকে তখন পেছনে ফেলে আসা নল-খাগড়ার বনে মুমূর্ষু বাঘ শেষ পর্যন্ত কোনরকমে মাটি হেঁচড়ে ঝোপের আড়ালে গিয়ে গা বাঁচাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সন্তোষবাবুর সতর্ক দৃষ্টি তাতে বাদ সাধলো। তাঁর সময়োচিত একটি গুলিতে বাঘের পূর্ণ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটলো।

॥ তিন ॥



ঝাঁয়া গণেশ

সে যেন ছিল দূরন্ত কালবৈশাখী। আচমকা ঝড়ো হাওয়ার প্রচণ্ড ঝাপটায় সব তচনচ করে দিয়ে কালবৈশাখীর বিধ্বংসী বেগ যেমন আস্তে আস্তে স্তিমিত ও অদৃশ্য হয়ে যায়--তারও অশুভ আবির্ভাব ঘটতো সেইরূপ অকস্মাৎ। দাঁতের গুঁতোয় শুঁড়ের টানে তালগাছের মত মোটা মোটা পায়ের চাপে এক-একটি অরণ্য পল্লীর জীর্ণ কুটিরগুলিকে গুঁড়িয়ে ধুলিস্মাৎ করে দিয়েই নিবৃত্তি হতো তার ক্ষণস্থায়ী উন্মত্ততার। তারপর ধীরে ধীরে ভীতবিহ্বল পল্লীবাসীর চোখের সম্মুখ থেকে ধূসরবর্ণের বিশালাকায় দেহটি তার অদৃশ্য হয়ে যেত অদূরবর্তী অরণ্যের অন্তরালে।

ঘটনার বিবরণ শুনছিলাম গৌরীপুরের বড় রাজকুমারী শ্রীমতী নিহারবালা বড়ুয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র আসামের বিখ্যাত শিকারী শ্রীমুনীন্দ্র নারায়ণ বড়ুয়ার কাছ থেকে।

কুকলুং সংরক্ষিত অরণ্য গোয়ালপাড়ার বিজনী থেকে প্রায় দশ মাইল উত্তরে। এই বনাঞ্চল সংলগ্ন সমস্ত কলোনীগুলিতে ভয়াবহ ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল আলোচ্য হাতীটির দৌরাত্ম্যে। রাতের অন্ধকারে, কখন বা দিনের বেলাতেও ধূমকেতুর মত সে হঠাৎ এসে উদয় হতো তিরিক্ষি মেজাজে। বহু কলোনী ধ্বংস হয়েছিল তার আচমকা আক্রমণে। তিন তিনটি অসহায় মানুষকেও সে শুঁড়ে জড়িয়ে আছড়ে মেরেছিল গাছের গায়ে। প্রাণহীন দেহ তাদের পিষে-গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারী পায়ের তলায়। এই ধ্বংস প্রবৃত্তির

পরিপ্রেক্ষিতে আসাম সরকারকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ঘোষণা করতে হয়েছিল এই বেপরোয়া হাতীটিকে 'রোগ এলিফ্যাণ্ট'রূপে।

শ্রীমুনীন্দ্রনারায়ণ বড়ুয়া আসাম সরকারের অনারারী ফরেস্ট অফিসার। সামাজিক কর্তব্যবোধে এবং সরকারী পদাধিকারে তিনি উদ্যোগ নিলেন এই পাগলা হাতীটির দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে। গৌরীপুর রাজপরিবারের অনেকের মত তাঁর মধ্যেও আছে দুর্দমনীয় শিকার নেশা—অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা। তাই সর্বক্ষণ লেগে রইলেন তিনি এই মূর্তিমান কালাপাহাড়ের পেছনে পেছনে।

যখনই কোন উপদ্রবের খবর আসে—যত সত্বর সম্ভব ছুটে গিয়েও তার নাগাল পাওয়া যায় না। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আপন খেয়াল চরিতার্থ করে সে উধাও হয়ে যায়। তার অবস্থিতির ইঙ্গিত দিয়ে জঙ্গলও কোন সাড়া দেয় না। কিছুদিন ঐভাবে চুপচাপ কাটে। আবার হঠাৎ কোথাও কোনদিন বিপর্যয় ঘটে—রাতের স্তব্ধতা ভঙ্গ হয় আর্তের কান্না ও কোলাহলে।

অভিজ্ঞ শিকারী মুনীন্দ্রবাবুর মন বিষণ্ণ। হাতীটির চলাফেরা ও অত্যাচারের সংবাদ সংগ্রহ ও তড়িৎগতি শিকার অভিযান পরিচালনার নিখুঁত ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন। তবুও ঘটনা পরম্পরায় কখন কখন মনে সন্দেহ জাগছে—হাতীটি যেন শিকারীকে বোকা বানাতে উঠে পড়ে লেগেছে।

বন্য পশুর মধ্যে হাতীর বুদ্ধি বোধ হয় অপেক্ষাকৃত বেশী। কিন্তু বলা বাহুল্য মানব সেবায় সক্রিয় অংশীদার এই মহাবলশালী পশুটি যদি তার অধিক বুদ্ধি নিয়ে একবার মত্ত হয়, তবে সে যে কিরূপ ক্ষয়ক্ষতি ও সন্ত্রাসের কারণ হতে পারে ভুক্তভোগী মাত্রেই তা জানেন।

শিকারী বা পলায়নপর মানুষের দিকে শুঁড়ে জড়িয়ে প্রচণ্ডবেগে পাথর বা মাটির চাপ, কাঠের টুকরো ইত্যাদি ছুঁড়ে মারা,—গাছের ডাল ভেঙ্গে পেটানো—আঁকড়ে ধরে জলে চোবানো, না মরা পর্যন্ত

গাছের গায়ে আছড়ানো, গাছ পাথর ফেলে অনুসরণকারীর পথ রোধ করা প্রভৃতি বহুবিধ কুট-কৌশলের উদ্ভাবক হচ্ছে দৈত্যাকার বুদ্ধিমান এই বন্যপশুটি। নিঃশব্দ পদচারণা ও প্রখর ঘ্রাণশক্তি এর সর্বপ্রকার কুকর্মের একান্ত সহায়ক। এদের যূথবদ্ধ আক্রমণে, এক-একটি বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র এক রাত্রের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়। ভারতের কোন কোন রাজ্যে ইদানীং বন্য-হাতীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের উপদ্রব বহু অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনুরূপ অনর্থ ও সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কুকলুং ফরেস্টের এই 'বাঁয়া গণেশ' হাতীটি। হাতীটির মাত্র বাম দিকের দাঁতটাই ছিল। তাই অসমীয়া ভাষায় একে বলা হতো 'বাঁয়া গণেশ'।

তিনটি ছেলে সন্ধ্যায় ধানক্ষেত পাহারা দিচ্ছে! চরতে বেরিয়ে 'বাঁয়া গণেশ' এসে হাজির হোল সেই ধানক্ষেতে। দলের সাহসী ছেলেটি সঙ্গীদের বলে—'দ্যাখনা, আজ আমি হাতী ধরবো।' কথা শুনে সঙ্গীরা তো অবাক—বলে কি? 'একদন্তীর' (এক দাঁতওয়ালা) বাঁয়া গণেশকে সবাই ভয় করতো। এক দাঁতের জন্য তাকে চিনতেও অসুবিধা ছিল না। 'আমি হাতীকে জড়িয়ে ধরা মাত্রই তোরা দড়িদড়া নিয়ে এসে ঝটপট ওকে বেঁধে ফেলবি।' দুঃসাহসী ছেলেটি সঙ্গীদের ফন্দি বাতলে দিলে। হাতী এগুচ্ছে—ছেলেটিও হাতী ধরার পাঁয়তারা দিচ্ছে। হাওয়ার গতি হাতীর সহমুখী। কাজেই মানুষের গন্ধ সে পাচ্ছে না।

গোছা গোছা ধান গাছ মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে মনের আনন্দে হাতী একপা-দু'পা করে সামনের দিকে আসে। দুর্বুদ্ধিবাজ ছেলেটিও এদিকে ধানক্ষেতের মধ্যে ডুব দিয়ে ওৎ পেতে থাকে হাতীর অপেক্ষায়। হাতী যেই মাত্র নিকটে এসেছে ছেলেটিও অমনি সামনের দিক থেকে বানরের মত এক লাফে হাতীর শুঁড় জাপটে ধরেই চীৎকার করতে থাকে—'ওরে আমি হাতী ধরে ফেলেছি—তোরা দড়িদড়া নিয়ে শিগগীর আয়। দেরী করিসনি।'

আচমকা অভাবনীয় কাণ্ডকারখানায় হকচকিয়ে গিয়ে হাতী তো ধানক্ষেতের মধ্যে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। ছেলেটিও এদিকে শুঁড় না ছেড়ে সমানে চেঁচাচ্ছে—'এত দেরী হচ্ছে কেন? শিগগির আয় তোরা।' কে আসবে? কোথায় সঙ্গীরা? তারা তো ততক্ষণে আতঙ্কে গ্রামের পথ ধরেছে!

হাতী ছাখে—আঁঠালুর মত আঁকড়ে থাকা এই উৎপাতটিকে শুঁড় থেকে খসাতে না পারলে স্বস্তি নেই। অতি কষ্টে নাছোড়বান্দা ছেলেটির কোমরে শুঁড়ের প্যাঁচ দিয়ে রাগে নয়, ভয় ও বিরক্তিতে হাতী আলতোভাবে একটি হালকা দোলায় ছেলেটিকে শূন্যভরে ছুঁড়ে দিল হাত দশেক দূরে ধানক্ষেতের মধ্যে। রাগের মাথায় শুঁড়ের প্যাঁচ কষলে ছেলেটির হাড়গোড় গুঁড়ো হতোই—ওদিকে ধানক্ষেতের মাটি নরম না থাকলে তার হাত-পা মাথাও হয়তো ভাঙতো।

খবর পেয়ে মশাল জ্বেলে, টিন পেটাতে পেটাতে লাঠি সড়কি বাগিয়ে গ্রামবাসীরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো ঘটনাস্থলের দিকে। হাতী পালিয়েছে। ছেলেটি ততক্ষণে গয়ের ধূলো-মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে ধানক্ষেত থেকে বেরিয়ে এসে হাত-পা নেড়ে গম্ভীরভাবে গ্রাম-বাসীদের বললে—তোমরাই তো দেরী করে ফেললে। নইলে আমি তো ধরেই ফেলেছিলাম। একটু আগে এলে বাঁয়া গণেশকে আজ নিশ্চয়ই বেঁধে ফেলা যেত। ডানপিটে ছেলেটি অক্ষত দেহে বেঁচে আছে দেখে তার বাপ-মায়ের ধড়ে প্রাণ এল।

কুকলুং ফরেস্ট বাংলোর লাগোয়া একটি কলোনী। বন-বিভাগের তৈরী নূতন প্লান্টেশন বাংলোটির কম্পাউণ্ড ঘেঁষে কলোনীর পূর্ব-দক্ষিণে এগিয়ে গিয়েছে। প্লান্টেশনের সমান্তরালে উল্টোদিকে বাতাবন—অর্থাৎ এলিফ্যান্ট গ্র্যাসের ঠাসা জঙ্গল। ফরেস্ট বাংলোর ত্রিশ-চল্লিশ ফুট দূর দিয়ে একটি ফায়ার লাইন—অর্থাৎ আগুনে পোড়া সড়ক ঐ বাতাবন ও প্ল্যান্টেশনের জঙ্গলকে দুইভাগে বিভক্ত করেছে।

কোন একটি সংবাদের সূত্র ধরে শিকারী মুনীন্দ্র বড়ুয়া আজ তিন দিন হোল কুকলুং বাংলোতে এসে রয়েছেন। এই তিনটি দিন চতুর্দিকের বিস্তৃত অরণ্যে সর্বমুখী চেষ্টা চলানো হয়েছে হাতীর সন্ধানে। কিন্তু সবই বৃথা। বিন্দুমাত্র খোঁজও পাওয়া যায় নি তার। এবার শিকারীর হাতে সময়ও কম। পরদিন সকালেই তাঁকে ফিরতে হবে বাড়ীতে গৌরীপুরে। প্রতিবারের চেষ্টা এভাবে ব্যর্থ হলে অশিক্ষিত অরণ্য-পল্লীর বাসিন্দাদের মনে কুসংস্কার বাসা বাঁধবে। তারা ভাবতে শুরু করবে— 'বাঁয়া গণেশ' নিশ্চয়ই অশরীরী শক্তি প্রভাবান্বিত হাতীরূপী অপদেবতা। তখন শিকার কার্যক্রমের কোন কিছুতেই আর এই সংস্কারান্ধ পল্লীবাসীদের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হবে না। হতাশাজনিত গভীর মনস্তাপে শিকারীর দুশ্চিন্তাভরা তৃতীয় রাত্রি অতিবাহিত হোল।

ভোরের হিমেল হাওয়ায় বাংলোর বারান্দায় বসে তিনি প্রাতঃরাশ সম্পন্ন করলেন। সম্মুখের লনে গাড়ী দাঁড়িয়ে। এবার ফেরার পালা। শিকারী-জীবনের বহু রোমাঞ্চকর ঘটনার পরীক্ষিত সঙ্গী '৫০০।'৪৬৫ বোরের শক্তিশালী রাইফেলটি রয়েছে পাশে দেয়ালে ঠেস দেওয়া।

পোশাক-আসাক পরে চেয়ারে বসে মুনীন্দ্রবাবু মাথা নীচু করে জুতোর ফিতে বাঁধছেন আর ভাবছেন—'আবার কবে সময় হবে এদিকে আসবার—কে জানে ?

ঠিক এই সময় কলোনীর দিক থেকে একটি ভয়ার্ত কোলাহল ভেসে এল-'হাতী আসছে, পালাও পালাও।' আতঙ্কিত কয়েকজন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো বাংলোর দিকে শিকারীকে খবর দিতে।

হাতী আসছে শুনেই শিকারী চমকে উঠলেন। রাইফেল হাতে জঙ্গলের দিকে তাকিয়েই তিনি বিস্মিত হয়ে দেখেন সত্যই বাঁয়া গণেশ দ্রুতপায়ে পূর্বোক্ত ফায়ার লাইন বরাবর অগ্রসর হয়ে চলেছে। লক্ষ্য তার কলোনীমুখী নয়, জঙ্গলমুখী। হয়ত ওর অন্তর্মনই ওকে

সাবধান করে দিয়েছে—'খবরদার কলোনীর দিকে যেয়ো না। ওদিকে মারণাস্ত্র হাতে তোমার শত্রু অপেক্ষা করছে।'

যোগাযোগটা খুবই অপ্রত্যাশিত। এই সুযোগ ছাড়া চলবে না—তা সে বাড়ীর দিকে যত জরুরী কাজই থাকুক না কেন। বাংলোর বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে শিকারী প্লান্টেশনের জঙ্গল ভেদ করে ছুটে চললেন সামনের দিক থেকে বেড় দিয়ে ফায়ার-লাইনের উপরই হাতীকে চ্যালেঞ্জ করতে। শিকারী প্রথম চোটেই 'ফ্রন্টাল শট'—অর্থাৎ সামনা-সামনি মাথায় আঘাত হানতে চান। বেড় দিয়ে সামনে এসে একটি শাল গাছের আড়ালে ঘাঁটি নিলেন তিনি।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, পল্লীবাসীর কোলাহলকে ভ্রূক্ষেপ না করে হাতী কিছুটা দ্রুতপায়েই এগুচ্ছে। 'একদন্তী' (এক দাঁতওয়ালা) বিশালাকায় এই অরণ্যদৈত্য বাঁয়া গণেশের চেহারা সত্যই ভয়াবহ।

হাতে রাইফেল দৃঢ়বদ্ধ। শিকারী-জীবনের এই অধ্যায়ে মনের আজ যে সাহস, হাতের নিশানায় যে বিশ্বাস—অতীতে কৈশোরে বার বছরের অপরিপক্ক অভিজ্ঞতায় নিশ্চয়ই তা ছিল না। তবুও দুঃসাহসী সেই কিশোরের একটি মাত্র গুলীর প্রচণ্ড আঘাতে লুটিয়ে পড়েছিল সেদিন অরণ্যের একটি হিংস্রতম শ্বাপদ—রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার—মুনীন্দ্র বড়ুয়ার বার বছর বয়সের বহ্নী-শিকার। পরবর্তী-কালে এই কৃতি শিকারীর ক্রমবর্ধিত সফলতার তালিকায় যুক্ত হয়েছে—ডোরাকাটা বাঘ ৩৩টি, চিতাবাঘ ২৯টি, বাইসন ২টি, বুনো মোষ ১টি ও হাতী ৩টি।

হাতী ৩টি নিশ্চয়ই অশুভ বেজোড় সংখ্যা। আর একটি অন্তত বাড়িয়ে গণ্ডা পুরোন করে রাখা দরকার। কিন্তু এক গণ্ডার পূরক সংখ্যা হিসেবে চতুর্থস্থলে এই মুহূর্তে সম্মুখে যে আবির্ভূত হয়েছে সে হচ্ছে এতদঞ্চলের অতি কুখ্যাত দুর্ধর্ষ গুণ্ডা হাতী 'বাঁয়া গণেশ'।

গণেশ নাকি শ্রীবৃদ্ধির প্রতীক। কিন্তু কুকলুং অরণ্যের বর্তমান এই অধিপতি 'বাঁয়া গণেশ' শুভ কি অশুভের প্রতীক সে বিচার পরে। আপাততঃ শিকারীর অন্তত এইটুকু বিলক্ষণ জানা আছে যে, সম্মুখে আগত ঐ মহাশক্তিধর পশুটি যদি এই শক্তিশালী মারণাস্ত্রের প্রথম আঘাত সহ্য করে চারপায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তবে পরবর্তী পরিস্থিতি সামলানো দায় হবে।

রাইফেলের দুটি নলেই গুলি ভরা! হাতের উপর বিশ্বাস থাকলেও শিকারীর বিশ্বাস নেই আজ তাঁর গুলিতে! কারণ ওগুলি বহুদিন আগেকার কেনা স্টক। বিপজ্জনক শিকারে এইরূপ পুরোনো গুলির উপর যে ভরসা করা উচিত নয় শিকারীও তা জানেন। কিন্তু জরুরী তাগাদায় এরূপ তাড়াহুড়োর মধ্যে বাড়ী থেকে রওনা হতে হয়েছে যে, নতুন ও পুরোনো গুলি সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তবুও শিকারীর আশা—এখনও কার্যকারিতা নষ্ট হয় নি এরূপ বেশ কিছু সংখ্যক গুলি সঙ্গে আনা ঐ লটের মধ্যেই আছে। সেই ভরসায় ও কিছুটা ঝুঁকিসহ তিনি অগত্যা বাঁয়া গণেশের সম্মুখীন হলেন। হলেন এই কারণে যে অপ্রত্যাশিত এই সুযোগ তিনি ছাড়তে চাননা।

হাতী মাথা দোলাতে দোলাতে পৌঁছে গেছে রাইফেলের পাল্লার মধ্যে। 'ফ্রন্টাল শট'। রাইফেল ধীরে ধীরে শিকারীর কাঁধে উঠে এল। ট্রিগারে আঙ্গুলের মৃদু চাপ। চাপের প্রথম ধাপ শেষ হয়েছে। রাইফেল স্থির লক্ষ্যে নিশানাবদ্ধ। হাতীকে আর এগুতে দেওয়া চলে না। ট্রিগারের কোলে আঙ্গুলের মৃদু দ্বিতীয় চাপ। 'টিক্'। একি? গুলি ফোটে নি। কি দুর্দৈব। দক্ষ শিকারী রাইফেল না নামিয়েই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থিরবিদ্ধ রেখেছেন গুলির বিলম্বিত বিস্ফোরণের আশায়। পুরোনো গুলিতে কখন কখন এরূপ হতে পারে। এক দুই তিন···'গুড়ুম'। জঙ্গল কাঁপিয়ে রাইফেল গর্জে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড পিছু ধাক্কায় হাতী হঠাৎ

থমকে গেল এবং পরমুহূর্তে ঘাসবনের দিকে ঘুরে হুড়মুড় করে সামনের জঙ্গল ভেঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আহত হাতী জঙ্গলে ঢুকেছে। আঘাত কতটা গুরুতর বোঝা যাচ্ছে না। কারণ রাইফেলের ট্রিগার পড়ার দু-চার সেকেণ্ড পরে আওয়াজ হওয়ায় গুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নাও লাগতে পারে। আঘাত মারাত্মক না হয়ে থাকলে, বলা বাহুল্য, আহত হাতীকে খুঁজে বের করার পরবর্তী কার্যক্রম যে অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও অরণ্য-পল্লীর অসহায় দরিদ্র মানুষদের নিরপত্তার প্রয়োজনে এই অবাঞ্ছিত কাজ সম্পন্ন করা শিকারীজীবনের অবশ্য পালনীয় নৈতিক কর্তব্য!

দেরী না করে ছয়-সাতজন খোঁজারু নিয়ে মুনীন্দ্রবাবু লম্বা ঘাসের বিপজ্জনক জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। দলের একজন লোকের হাতে একটি বন্দুক। নিজের ভারী রাইফেলটি শিকারী অন্য একজনের হাতে দিয়েছেন বইবার জন্য।

অতি সতর্কতার সঙ্গে আহত হাতীর পলায়নপথ অনুসরণ করে চলেছে সবাই। ঘাসবন পেরিয়েও গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছেন শিকারী সদলবলে। হাতীর কোন হদিশ মেলে নি। অতি শক্তিশালী রাইফেলের প্রচণ্ড আঘাত কপালে সয়ে এতটা পথ চলার সামর্থ যখন তার আছে, তখন প্রয়োজনবোধে প্রতি-আক্রমণের ক্ষমতারও হয়তো তার অভাব হবে না। শিকারী সঙ্গীদের সাবধান করে দিলেন!

আহত বিপজ্জনক বন্যপ্রাণীর অনুসন্ধানে যথেষ্ট ধৈর্য ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। শিকার পরিকল্পনার এই ধরনের কষ্টসাধ্য কাজে শ্রীবড়ুয়ার নিষ্ঠা ও উৎসাহ অপরিসীম। কাজেই পলায়নপর 'বাঁয়া গণেশের' পেছনে তাঁর সদলবলে পদ চালনারও বিরাম নেই।

কয়েকটি ঠাসা ঝোপের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতেই সামনে থেকে হাতীর কান নাড়ার 'ফটাফট' শব্দ শোনা গেল। আর যায়

কোথায়—কিছু বলবার পূর্বেই শিকারীর পেছন দিক থেকে তাঁর সঙ্গীরা সব মহা আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেদিকে পারে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো রাইফেল বন্দুক নিয়েই। ক্ষিপ্ত ও দুর্দান্ত প্রকৃতির একটি আহত হাতী সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি শিমূল গাছে মাথা ঠেস দিয়ে—আর এদিকে এই মুহূর্তে অদূরে দাঁড়িয়ে তার পরম প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ শূন্য হাতে অস্ত্রহীন সঙ্গীবিহীন অবস্থায়। কি অভাবনীয় অদৃষ্টের পরিহাস।

উপরোক্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে, উপায় নেই, শিকারী অতি সন্তর্পণে ও সংযত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে পিছু হটে এলেন। হাতী মানুষের সাড়ায় স্থান ত্যাগ করে সামনে এগিয়ে গেল গভীর বনের দিকে। আপাতত বিপন্মুক্ত হয়ে শিকারী বিক্ষিপ্ত বৃক্ষের উচ্চশাখায় অতি কষ্টে আবিষ্কার করলেন তাঁর তথাকথিত সাহসী সহ-যোদ্ধাদের। হাঁক-ডাকে সবাইকে গাছ থেকে নামিয়ে এনে সাহস দিয়ে কোন রকমে আবার চালু করা সম্ভব হোল হাতীর পিছু ধাওয়া। এবার শিকারী তাঁর রাইফেলবাহককে রাখলেন সামনের দিকে এই মতলবে যাতে আবার হাতীর সাড়া পেলে সে পেছন থেকে রাইফেল নিয়েই চম্পট দিতে না পারে। দলের মধ্যে ছিল অপেক্ষাকৃত সাহসী একজন আদিবাসী শিকারী—নাম গুরমাঁও ব্রহ্ম। বন্দুকটি দেওয়া হোল এবার তার হাতে।

পূর্বোক্ত শিমূল গাছের কাছে এসে পাওয়া গেল রক্তের দাগ। মাথায় গুলির আঘাতে অত্যধিক যন্ত্রণায় হাতী শিমূল গাছের গায়ে মাথা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। স্থান ত্যাগ করে গেলেও এখনও হয়ত সে রক্তক্ষয়ী জখম নিয়ে বেশী দূর যেতে পারে নি। দ্রুতপায়ে একটু ফাঁকা পথে রক্তের দাগ বরাবর প্রায় আধ মাইল গিয়ে দেখা গেল হাতী 'মানাস' স্যাংচুয়ারীর দক্ষিণ দিককার সীমানা পথ পেরিয়ে উত্তরে ভুটান পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

স্যাংচুয়ারীর মধ্যে শিকারে বন-বিভাগের অনুমতী দরকার।

শিকারী বাধ্য হয়ে ফিরে এলেন এবং ঘণ্টাখানেক পরে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারের অনুমতি নিয়ে পুনরায় গিয়ে প্রবেশ করলেন 'মানাস' স্যাংচুয়ারীর ভিতরে।

এদিককার জঙ্গল একটু ফাঁকা। কাজেই অনুসরণে অসুবিধা ও ঝুঁকিও কম। এবারও বহুদূর পর্যন্ত এগিয়েও হাতীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। প্রায় আড়াই মাইল পথ পেরিয়ে আসার পর দূর থেকে হাতীর ধূসরবর্ণের দেহটি নজরে এল। এবারও আহত পশুটি কোন একটি গাছে মাথা ঠেকিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করছে। এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, মাথার আঘাত তার গুরুতর এবং সেই জন্য যন্ত্রণায় সে বার বার গাছে মাথা ঠেকিয়ে বিশ্রাম করছে। এত বড় বলশালী প্রাণীর জীবন্ত অবস্থায় এই যন্ত্রণাভোগ চোখে দেখা যায় না। কাজেই দ্বিতীয় গুলিতে ওর জীবন শেষ করে যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেওয়া দরকার।

রাইফেল হাতে নিলেন শিকারী। এবার তাঁর মনে 'টেম্প্ল' শটের চিন্তা। কিন্তু হাতীর গোটা মাথাটি রয়েছে গাছের ডালপালার আড়ালে—টেম্প্ল শটের সুযোগ কোথায়? হাতীকে পাশ কাটিয়ে শিকারী একাকী নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। তবুও নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থল নজরে আসে না। কিন্তু উপায় নেই। এই দুর্ধর্ষ যখমী পশুকে সামনে নিয়ে আর দেরী করাও চলে না। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর থেকে শিকারী হাতীর মাথা বরাবর কতকটা আন্দাজেই গুলি করলেন। চোখের পলকে জানোয়ারটি ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা তেড়ে আক্রমণ করে গেল শিকারীর দিকে। বোঝা গেল গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, বা মারাত্মক আঘাত হয়নি।

মূর্তিমান যমদূতের মত প্রাগৈতিহাসিক দানবটি ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে শিকারীর দিকে। রাইফেল উদ্যত রেখেই অকম্পিত চিত্তে শিকারী নিশ্চল দাঁড়িয়ে আক্রমণ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে। নিজেকে ও মাটিতে অবস্থানরত সঙ্গীদের বাঁচাতে হলে এ ছাড়া

দ্বিতীয় কোন উপায়ও নেই এই মুহূর্তে। 'গুড়ুম'—প্রায় পঁচিশ গজের মাথায় তৃতীয় গুলি নিক্ষিপ্ত হোল।' কি সর্বনাশ, হাতী এখনও এগুচ্ছে—গতি তার রুদ্ধ হয়নি। অর্থাৎ এগুলিও ব্যর্থ। অথচ এদিকে রাইফেলের দুটি নলই গুলিশূন্য। আর রক্ষা নেই—মৃত্যু অবধারিত। সঙ্গের লোকজন পেছনে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়েছিল। মহা আতঙ্কে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য তারা এবারও ছুটে পালালো শিকারীকে একা ফেলে রেখে। এই বিপদের মধ্যে ভরসা এইটুকু যে হাতিয়ারটি এবার শিকারীর হাতছাড়া হয়নি।

রোষোম্মত্ত হস্তীর পদভরে যেন মেদিনী কাঁপছে। শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র হাতে থাকা সত্ত্বেও অসম সাহসী মুনীন্দ্র বড়ুয়ার নিকট যেন মনে হচ্ছে একান্তই অপ্রতিরোধ্য হয়ত বা 'বাঁয়া গণেশের' এই মুহূর্তের আক্রমণমুখী দুরন্ত রোখ। তবুও শেষ চেষ্টা করতে হবে। নিছক দাঁড়িয়ে থেকে বেঘোরে প্রাণ দেবার পাত্র তিনি নন। মৃত্যুর মুখোমুখী অবস্থান তাঁর জীবনে এই প্রথম নয়।

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ক্ষণিকের বিহ্বলতা কাটিয়ে এক্ ঝটকায় রাইফেল খুলে গুলি ভরে নিলেন শিকারী। এই গুলি দুটি ফুটবে কিনা তারও কোন স্থিরতা নেই। কিন্তু এই জরুরী মুহূর্তে সে চিন্তা অনর্থক। অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে।

একটি প্রকাণ্ড বুল-ডোজারের মত বিশালদেহী হাতী ততক্ষণে প্রায় দশ গজের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছে। আর সামান্য কয়েক গজ এগুতে পারলেই লম্বা শুঁড় বাড়িয়ে নিমেষের মধ্যে সে ধরে নেবে তার প্রতিপক্ষকে। তারপর সুরু হবে চরম যন্ত্রণাদায়ক বিভৎস হত্যাকাণ্ড। হয়ত আছড়ে মারবে, নয়ত পায়ে পিষে। অথবা এক একটি করে হাত-পা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টেনে টেনে ছিঁড়বে। নাঃ, আর ভাবা যায় না—ভাববার অবকাশও নেই আর! রাইফেলের 'নিশানা-লাইন' মেলাবারও আর সময় নেই। এক মুহূর্ত দেরী মানে নিশ্চিত মৃত্যু। কাজেই অভ্যস্ত হাতে হাতিয়ার তোলা আর

মারা—'গুড়ুম'। গুলির শব্দে চারিদিকের জঙ্গল কেঁপে উঠলো। একটি দুঃসহ যান্ত্রিক ধাক্কায় হাতীর দেহটি যেন হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে গেল এবং টলতে টলতে ছুটে গিয়ে সে হুড়মুড় করে সম্মুখের একটি ঘাসবনে প্রবেশ করলো। পবক্ষণেই যেন মনে হোল পাহাড়ের বিরাটএকটি ধ্বস সশব্দে ওদিকে মাটিতে আছড়ে পড়লো।

একটি প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটা যেন এই মুহূর্তে বয়ে গিয়েছে শিকারীর স্নায়ুর উপর দিয়ে। একটি দুটি করে চারটি গুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছে হাতীর উপর। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, চতুর্থ গুলির পরও শিকারী নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। উপযুক্ত গুলি নির্বাচনের ত্রুটির জন্য মুনীন্দ্রবাবুর আজ এই বিভ্রাট।

শিকারীর শুনতে বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি যে হাতী পালাবার পর ঘাসবনের ভিতর দিককার, আওয়াজ ও আলোড়ন বেশিক্ষণ স্থায়ী ছিল না। এ থেকে এবং শেষ শব্দের ধরনে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, হাতী হয়ত বেশীদূর যেতে পারেনি। পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে শিকারী লোকজন ডেকে ডুকে আবার জড়ো করলেন এক জায়গায়। ঠিক এই সময় হঠাৎ ঘাসবনের দিক থেকে কয়েকবার 'ভ্রু', 'ভ্রু' শব্দ কানে এল। অভিজ্ঞ শিকারীর বুঝতে অসুবিধা হোল না যে, এ শব্দ নিশ্চিতই মৃত্যুকালীন শ্বাসকষ্টজনিত। গাছে লোক উঠিয়েও ওদিকে কিছু দেখা গেল না। অগত্যা সাহসে ভর করে রাইফেল বাগিয়ে মুনীন্দ্র বড়ুয়া একাই এগিয়ে গেলেন ঘাসবনের মধ্যে হাতীর খোঁজে এবং কয়েক গজ এগিয়েই বিস্মিত চোখে দেখলেন—কুখ্যাত 'বাঁয়া গণেশে'র বিশালাকায় প্রাণহীন দেহটি এলিফ্যাণ্ট গ্র্যাসের মধ্যেই মাটিতে লুটিয়ে আছে। মৃত হাতীর দাঁতটি ছিল লম্বায় ৮ ফুট ৯ ইঞ্চি—ওজনে ৩২ পাউণ্ড। দৈহিক উচ্চতা ১০ ফুট ২ ইঞ্চি।

॥ চার ॥



পাগলীর সাহান

অপরূপ সুন্দরী অরণ্যকন্যা সে। লোক মুখে পাগলী পরিচয় তার। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় বিন্দুমাত্র পাগলামীর লক্ষণ নেই তার মধ্যে। বুনো হাতীর দল সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে আসাম উপত্যকার বন থেকে বনান্তরে।

আসামের জঙ্গলে হাতী ধরার দলগুলোর কারো কারো তাকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। দেখে যাদের মনে ভয় ভক্তি এসেছে তারা বেঁচে গেছে। এমনকি লাভবানও হয়েছে। কিন্তু ভবঘুরে সুন্দরী এই যুবতীকে বিয়ে করার লোভও যে কারো কারো মনে উঁকি ঝুঁকি না দিয়েছিল এমনও নয়। আসামের হাতীধরা দলের ডেঁটেল এক সর্দার ফাঁদিতো কথার ছলে নিজের গোপন মন বাসনাটা একদিন সবার সামনে বড় গলায় বলেই ফেললে—

'দেখা পেলে ধরে এনে আমি তাকে সাদি করবো'।

দেখা সে পেয়েছিল ঠিকই একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হল্টুগাঁও ডিভিশনের ভুর নদীর পাড়ে বরডাঙ্গির জঙ্গলে। ফাঁদি তার সাদির প্রস্তাবটা সুন্দরীর কাছে পাড়বার ফুরসুৎ পেয়েছিল কিনা জানা নেই। তবে বেচারার জানটা যে গিয়েছিল পাগলীর দীর্ঘদন্ত দুর্ধর্ষ রক্ষক হাতীটার দাঁতের গুঁতোয় সেটা প্রমাণিত হয়েছিল পরবর্তী অনুসন্ধানে।

কিম্বদন্তীর এই বনবালার কথা আমি প্রথম শুনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু গৌরীপুরের রাজবাড়ীর ভাগ্নে মুণীন্দ্র নারায়ণ বড়ুয়ার কাছ

থেকে। সে কাহিনী সমর্থিত হয় মেজ রাজকুমার লালজীর কথায়। ১৯৭২ এর পুরো এপ্রিল মাসটা যখন আমি আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন রায়মনা রেঞ্জের দুর্গম বনে লালজীর ক্যাম্পে ছিলাম তখন একদিন কথাপ্রসঙ্গে লালজী বললেন—

'আসামের আরণ্যক ঘটনাদি সম্বন্ধে আপনার অসীম কৌতূহল জানি। কিন্তু সে কৌতূহল আপনার অপূর্ণ থেকে যাবে যদি না আপনি 'পাগলির-সাহান' কাহিনীটি জানতে পারেন'। অসমীয়া ভাষায় 'সাহান' অর্থে বুনো হাতীর দল।

'এই কাহিনী কি আপনি নিজে বিশ্বাস করেন? জিজ্ঞেস করেছিলাম লালজীকে'।

জ্বলন্ত সিগরেটের মাথার ছাইটা আঙ্গুলের টোকায় ঝেড়ে ফেলে একটা সুখটান দিয়ে লালজী বললেন—

'আগে বিশ্বাস করতাম না। এখন পুরো না হলেও বারো আনা বিশ্বাস করি। করি তার কারণ আমার নিজের হাতী ধরার দল একবার দু'বার নয়, কম করে তিনবার এই তথাকথিত পাগলীর দর্শন পেয়েছে'।

'তথাকথিত বলছেন কেন'?

'বলছি এই কারণে যে চেহারা, বেশভূষা, চালচলন কোন কিছুতেই সেই যুবতী পাগলী নয়। দেববালার মত চেহারা তার। আমার দলের ফাঁদি ও মাহুতরা সৎ ও সাহসী, এবং আমাকে গুরুদেবের মত ভক্তি করে। আমার কাছে এই ধরনের একটা কাহিনী বানিয়ে বলার মত লোক তারা নয়। তাছাড়া আমি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলাম বন পরিক্রমায়। কোন মনগড়া অনুরূপ কাহিনী আমার কাছে পেশ করার সাহস কারো নেই'।

'পুরো বিশ্বাস না করে বারো আনা বিশ্বাস করেন কেন'?— বিনীতভাবে প্রশ্নটা রেখেছিলাম।

'করি স্বচক্ষে দেখার সুযোগ মেলেনি বলে'—লালজী সংক্ষেপে উত্তরটা দিলেন। সিগরেটের আগুনটা ততক্ষণে আঙ্গুলে সেঁকা

দেবার উপক্রম করছে। লালজী ওটাকে ছাইদানিতে চেপে নিভিয়ে দিয়ে উঠে গিয়ে একটা হাতখাতা নিয়ে এলেন। দীর্ঘদিনের হাতী-ধরার রিপোর্ট সাল তারিখসহ ওতে টোকা আছে। নির্দিষ্ট পাতাটা বের করে তিনি তাঁর দলের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিলেন—

১৯৫৪ সাল। হল্টুগাঁও ফরেষ্ট ডিভিশন। নন্দী ফাঁদিসহ মন, কালু, ইজাঝুর—চারজনে বেরিয়েছে হাতী ধরতে। সারা চম্পামতী নদীর পাড়ের জঙ্গলটা দিন ভোর ঢুঁড়ে বেড়িয়েও কোন বুনো হাতীর হদিস মিললো না। দুপুর গড়িয়ে গেছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত তারা একটা গাছের তলায় বসে রান্নাবান্নায় মন দিয়েছে। হঠাৎ জঙ্গলে হাতীর সাড়া পাওয়া গেল। এগিয়ে গিয়ে ওরা দেখে সাদা কাপড় পরা এলোকেশী অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী গাছতলায় বসে। ফাঁদি মাহুতরা তার সামনে ভক্তিভরে ধুনি জ্বেলে দিল ও রাঁধা ভাত পাতায় বেড়ে দিয়ে তার সামনে স্তব স্তুতি করতে রইল। মেয়েটি কথা বলেনা। শুধু হাসে। কিছুটা ভাত ধুনির আগুনে পুড়িয়ে কাঠি দিয়ে টেনে এনে খুঁটে খুঁটে খেল সে। তারপর বুনো-হাতীর দলসহ গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফাঁদিরাও এদিকে তখুনি জঙ্গলে নেমে স্বল্প চেষ্টায় চারটি বাচ্চা হাতী ধরতে সমর্থ হোল।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে ঐ হল্টুগাঁও ফরেষ্ট ডিভিশনেরই ঢোলপানি ব্লকের জঙ্গলে। এবার ছিল বিজনী ও গৌরীপুরের দুই হাতীধরা দলের যৌথ অভিযান।

বিজনীর দলের দুটো হাতী। কুনকি হাতীটার নাম 'গোলাপী'। ফাঁদির নাম হাঁসুয়া। মাহুত আসরফি। দ্বিতীয়টি হস্তিনী। নাম মধুমালা'। ফাঁদির নাম 'মধু'। গৌরীপুর দলের হাতী দুটির নাম 'উইলিয়ম' ও 'লালসিং'। ফাঁদি 'গুজিলাল' ও মাহুত 'খুরকি'।

জঙ্গলের সাড়ায় ওরা এগিয়ে যেতেই দেখা হয়ে গেল 'পাগলীর সাহানের' সঙ্গে। সামনে মহড়া নিচ্ছে তার দৈত্যাকার দাঁতালটা। সঙ্গী অন্যান্য সবাই ঘাবড়ে গেল। কিন্তু বিজনীর দলের ফাঁদি

'হাঁস্থয়া' তাচ্ছিল্যভরে এগুতে চাইল। হয়ত মনে তার পাগলী স্থন্দরীকে নিকা করার সাধ। সাধ তার সঙ্গে সঙ্গেই মিটলো। পাগলীর গুণ্ডা হাতীটা রুখে এসে হাঁস্থয়ার হাতী গোলাপীকে প্রচণ্ড ধাক্কায় মাটিতে পেড়ে ফেললে। হাঁস্থয়া বেচারা গোলাপীর দেহের নীচে চাপা পড়লো ; এবং হতভাগ্য মাহুত আসরফি একটা গাছের গায়ে চেপটে গেল। তুজনেই ওরা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। আক্রান্ত হাতী গোলাপীর মাথায় প্রচণ্ড চোট লাগে ও আহত অবস্থায় মাস চারেক ভুগে পরে সেও মারা যায়।

সর্বশেষ ঘটনা ঘটে ১৯৬৯ সালের বর্ষাকালে গাজালী মেলা-শিকারে। ফাঁদি ও মাহুতদের নিয়ে ওরা ছিল সেদিন পাঁচজন—যথা,—তীর্থ, মন, কালু, গুজিলাল ও উমেশ। কচুগাঁও ডিভিশনের বাম্বা ব্লকে ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে বুনো হাতীর সন্ধানে।

প্রবল তুর্যোগপূর্ণ বর্ষার রাত। সকলে ক্যাম্পে বসে আছে। জঙ্গলের সাড়ায় বোঝা যায় বুনো হাতীর পাল নেমেছে জঙ্গলে। ভোর হতেই ওরা খোঁজে গিয়ে দেখে পথের ধারে বসে আছে সেই স্থন্দরী নারী। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে—কিন্তু কাপড় ভিজছেনা তার। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। ফাঁদি মাহুতরা অভিভূত হয়ে স্তব স্তুতি আরম্ভ করলো। একভাবে কিছুসময় বসে থেকে নারীটি হাসতে হাসতে স্থান ত্যাগ করে অন্য দিকে চলে গেল। বুনো হাতীর দলও তাকে অনুসরণ করলো। ফাঁদিরা তখন সাহস করে জঙ্গলে ঢুকে কিছু সময়ের চেষ্টাতে অন্য তিনটি কম বয়সী বুনো হাতী ধরতে সমর্থ হোল।

হস্তীরাণী এই রহস্যময়ী নারীর বন-পরিক্রমার চৌহদ্দি হচ্ছে উত্তরে ভুটান, দক্ষিণে আসামের নর্থ ট্রাঙ্ক রোড, পূবে মানাস ও পশ্চিমে সঙ্কোস নদী।

লালজী ও মুণীন্দ্রবাবুর কাছে এও শুনেছি যে রহস্যজনক হলেও আসামের ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেই আজ আর এই কাহিনীকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে পারছেন না।

॥ পাঁচ ॥



হাতীর আত্মদান

বিশাল দেহ দীর্ঘদন্ত অরণ্য-দানবটি ভয়ে নদী সাঁতরে পালিয়েছে —এই ধারণা নিয়ে শিকারী নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু চমক ভাঙলো তার পেছনে নদীর দিক থেকে ভেসে আসা চড়া ও তীক্ষ্ণ সুরের বৃংহন শব্দে। মুহূর্তে চোখ ঘুরিয়ে তিনি দেখেন কালবৈশাখীর ঝড়ের তেজে ছুটে আসছে সে তার শত্রুকে লক্ষ্য করে। কোন চিন্তা ভাবনার আর সময় ছিল না। আত্মরক্ষার তাগিদে রাইফেল ঘুরিয়ে গুলি একটা ছুঁড়তেই হোল, এবং ঐ প্রথম গুলিটির প্রচণ্ড আঘাতেই রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল তার দুরন্ত গতি। নইলে শিকারীসহ সবারই মৃত্যু ছিল সেদিন অবধারিত।

১৯৪৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। স্বাধীন ভারতের প্রথম শারদোৎসব আগতপ্রায়। সবার মনে খুশির আমেজ। সেই আমেজভরা মন নিয়ে মুণীন্দ্রবাবু অর্থাৎ বড় রাজকুমারী নীহারবালা বড়ুয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র মুণীন্দ্রনারায়ণ বড়ুয়া সবে প্রাতরাশ শেষ করে বৈঠকখানায় এসে বসেছেন। এমন সময় রূপসী থেকে একটি লোক এসে খবর দিল যে, দুটো দাঁতাল বুনো হাতী রূপসী জমিদারীর আগে গদাধর নদীর দক্ষিণ পাড়ে একটি গ্রামের লাগোয়া বাঁশ বনে এসে ঢুকেছে।

কথাটা শুনে মুনীন্দ্রবাবুর প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। হাতী হয়ত এসেছে ঠিকই। তবে কোন জমিদারের পোষা হাতী হবে হয়ত। মানুষের বসতি এলাকার অত নিকটে দিনের আলোয় বুনো হাতী এসে ঢুকবে না নিশ্চয়ই। যাই হোক স্বচক্ষে ব্যাপারটা একবার দেখা

দরকার। গাড়ী চালিয়ে দু-তিনজন বন্ধুসহ মুণীন্দ্রবাবু ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হলেন। রূপসী গৌরীপুর থেকে মাত্র তিন-চার মাইলের পথ পৌঁছুতে দেরী হোল না। তখন সকাল নটা হবে।

মুণীন্দ্রবাবু দেখে অবাক হলেন—সত্যিই এক জোড়া বুনো 'মালজুড়িয়া' হাতী বাঁশবনে চরে বেড়াচ্ছে। দুটো মদ্দা হাতী দলছাড়া হয়ে যখন একসঙ্গে থাকে তখন তাকে 'মালজুড়িয়া' বলে। এক্ষেত্রে দুটোই মদ্দা ও দাঁতাল। একটি বিশালকায় ও দ্বিতীয়টি কম বয়সী ছোট! তাজ্জব ব্যাপারই বটে। যাই হোক, সঙ্গে রাইফেল বন্দুক নেই। মিঃ বড়ুয়া সময় নষ্ট না করে গাড়ী ঘুরিয়ে দ্রুত ফিরে চললেন বাড়ীর দিকে। উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য হাতী শিকারের ব্যবস্থা করা। তবে গুলি চালিয়ে হত্যা করে নয়। বড়টাকে কোন রকমে তাড়িয়ে দিয়ে ছোটটার গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে ওটাকে জ্যান্ত পাকড়াও করা। মাতুল বংশের হাতীর নেশা। মুণীন্দ্রবাবুর মধ্যেও সংক্রামিত হচ্ছে বোধ হয়। না, ঠিক তা নয়। তবে এমন সহজ সুযোগটা যখন গায়ে পড়ে সামনে এসেছে তখন একটু চেষ্টা-চরিত্তির করে দেখাই যাক না।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে, মাতুলবংশের বর্তমান বংশধরদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হস্তী-বিশারদ সেই 'লালজী'—অর্থাৎ মেজ রাজকুমার প্রকৃতিশচন্দ্র বড়ুয়া গৌরীপুরে উপস্থিত নেই। রাজবাড়ীর বেশির ভাগ পোষা ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত হাতীগুলিকে নিয়ে তিনি গোয়ালপাড়া জেলার প্রতাপগঞ্জে ক্যাম্প করে আছেন। তাঁকে খবর দিয়ে আনবার আর সময় নেই। তা হলে উপায়? উপায় হচ্ছে এস্টেটের বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ কৃষ্ণ ফাঁদিকে খবর দেওয়া।

খবর পেয়ে কৃষ্ণ ফাঁদি যদিও এল, কিন্তু মাথা চুলকে বললে—আজ্ঞে, কুনকি—অর্থাৎ মাদী হাতী তো মাত্র ছয়টা জোগাড় হতে পারে। গোলাপী, সুন্দরমালা, কাননবালা, কমলপিয়ারী, ফুল ও নূরজাহান।

—ছোট বাঁশ বনে মাত্র ছুটো মাতাল 'মালজুড়িয়া' হাতী। ছয়টার বেশি কুনকির কি দরকার আছে? মুণীন্দ্রবাবু প্রশ্ন করলেন।

—হলে তো এতেই হওয়া উচিত—যদি কিনা বড় দাঁতালটার হালচাল বেয়াড়া না হয়। কৃষ্ণ ফাঁদি নিজের টাক মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কথাগুলো বললে।

—ভয় নেই। আমি রাইফেল বন্দুক নিয়েই যাচ্ছি। তুমি দেরী না করে কুনকিগুলো ও অন্যান্য মাহুত ফাঁদিদের নিয়ে এগোও।

ফাঁদ ও দড়াদড়ি গোছগাছ করে নিয়ে ছ'টা হাতীর ছু'জন ফাঁদি ও মাহুতসহ কৃষ্ণ ফাঁদি রূপসীতে গিয়ে হাজির হোল। বেলা তখন ছুটো আড়াইটে হবে। মুণীন্দ্রবাবু গাড়ী নিয়ে পৌঁছে গেছেন তার আগেই। সঙ্গে গেছেন তাঁর মা, মেশোমশাই, ছোট ভায়েরা ও ছু-চারজন বন্ধু। মাতৃদেবীসহ সবাই তাঁরা শিকার-প্রিয়।

বাঁশবনটির উত্তরে গদাধর নদী, এবং ঐ নদীর পাড়-বরাবর পশ্চিমে এগোলে পড়বে বিমলা ব্রীজ। কুনকি হাতীগুলোকে প্রথমে গ্রামের মধ্যে একটু আড়ালে রাখা হোল। ওদিকে বুনোরা কিন্তু তখনও নিশ্চিন্তে বাঁশবনে চরে বেড়াচ্ছে। মুণীন্দ্রবাবু কৃষ্ণ ফাঁদির সঙ্গে ফন্দি-ফিকির নিয়ে কিছুটা আলোচনা করলেন ও তারই পরামর্শ মত একটি গদি আটা হাতীতে গিয়ে উঠলেন।

—বাবু বড় দাঁতালটা যদি তেড়ে আসার ঝোঁক দেয় তো আমি বলা চোটেই আপনি ওর সামনের পায়ের নখে বন্দুকের ছররার গুলি করবেন। তা'হলেই ও পালাবে—কৃষ্ণ ফাঁদি দাঁতাল খেদানর কায়দাটা বাতলে দিলে।

মুণীন্দ্রবাবু বন্ধু অজিত বড়ুয়াকে নিজের হাতীতে তুলে নিয়ে পেছনে বসালেন ও তার হেফাজতে দিলেন একটি '৫০০ বোরের এক্সপ্রেস রাইফেল। নিজের কাছে রাখলেন '১২ বোরের একটি শট-গান ও নিজের প্রিয় '৪৬৫ বোরের দোনলা রাইফেলটি। সঙ্গে

রইল মাত্র তিনটি রাইফেলের গুলি ও শট-গানের কয়েকটি ছররা। ওদিকে মা ও ভাই বন্ধুরা এগিয়ে গিয়ে ব্রীজের মাঝে একটি ট্রাকের উপর দাঁড়ালেন হাতী ধরা দেখতে।

দু-তিন একরের বাঁশবন। বিক্ষিপ্তভাবে বাঁশ ঝাড়গুলি ছড়িয়ে আছে সমস্ত এলাকা নিয়ে। হাতী দুটো আপন মনে শুঁড় দিয়ে বাঁশ গাছের ডগা টেনে নামিয়ে গোছা-গোছা কচি কঞ্চি সমেত পাতা ছিঁড়ে মুখে পুরছে। সেই সকাল থেকে আরম্ভ করেছে—এখন দুপুর গড়িয়ে যায়। উদর-পূর্তি আর হয় না। সমানে খেয়ে চলেছে ওরা।

হাতী ধরার দল ছ'টি কুনকি হাতীর পিঠে চেপে গ্রামের পথ বেয়ে ধীরে ধীরে বাঁশ বনে গিয়ে নামলো। কৃষ্ণ ফাঁদি আগে, তার পাশে রাইফেল হাতে মুণীন্দ্রবাবু। ওদের দু'জনের পোষা কুনকি দুটি খুবই বাধ্য ও নির্ভরযোগ্য। পেছনে অন্য ফাঁদিরা। সবাই দড়ি কাছি নিয়ে তৈরী ও সতর্ক।

হাতী ধরার উদ্দেশ্যে বুনো হাতীর দিকে এগোনোর সময় মাহুতরা পিছিয়ে আসে। ফাঁদিরা গিয়ে তখন হাতীর কাঁধে মাহুতের আসনে বসে ও নিজেরাই হাতী পরিচালনা করে। দক্ষ মাহুত না হয়ে ফাঁদি হওয়া যায় না। মাহুতের আসনে বসেই ফাঁদিরা সুযোগ বুঝে দড়ির ফাঁস ছোঁড়ে বুনো হাতীর মুখের ওপর।

মজা হচ্ছে, বুনো হাতীর দলের রক্ষক সর্দার হাতীটা নিকটে না থাকলে ফাঁদিরা নির্ভয়ে নিজেদের পোষা হাতীতে চেপে বুনো হাতীর দলের মধ্যে মিশে যেতে পারে। বুনোরা ঐ সব মনুষ্য পরিচালিত নবাগত হাতীদের নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। সুযোগ বুঝে ফাঁদিরা তখন ধীরে ধীরে কম বয়সী বুনো বাচ্চাদের কাছে যায় ও পাশ থেকে মাথার উপর দিয়ে দড়ির ফাঁদ ছুঁড়ে মারে। ফাঁসের ঘেরটা এমনই বিস্তৃত থাকে যাতে সহজেই সেটা মাথার উপর দিয়ে গলার দিকে গলে যায়। কিন্তু লম্বা শুঁড়ে তো ফাঁসের দড়ি আটকাতে পারে। পারে বইকি। কিন্তু অনেক সময় তা হয় না।

হয় না তার কারণ হচ্ছে—হাতীর শুঁড় অত্যন্ত স্পর্শকাতর। লজ্জাবতী লতার মত। যে মুহূর্তে শুঁড়ে তার ফাঁসের ছোঁয়া লাগে সেই মুহূর্তেই হাতী তার জন্মগত স্বাভাবিক প্রবণতায় শুঁড়টা ক্ষণিকের জন্য ভেতর দিকে গুটিয়ে নেয়। আর ফাঁসটা তখন কণ্ঠহারের মত গলায় ঝুলতে থাকে। সতর্ক ফাঁদি এ সময় নিশ্চেষ্ট বসে থাকে না। একটা ঝটকা পেছন টানে ফাঁসের ঘের হাতীর গলায় শক্ত করে জড়িয়ে দেয় ও ঝটপট ফাঁদের দড়ি নিজের হাতীর সঙ্গে টেনে বেঁধে ফেলে। আরম্ভ হয় তখন প্রবল টানাটানি ও ধস্তাধস্তি। এটাই হচ্ছে অত্যন্ত বিপজ্জনক সময়।

ফাঁদে পড়া বাচ্চা হাতীটার চীৎকার শুনে তার মা, দলের সর্দার কখনও বা গোটা দলটাই রুখে আসে বাচ্চার সাহায্যে শত্রুর মোকা-বিলায়। প্রতিপক্ষ ফাঁদিদের দিক থেকে তখন হৈ-হল্লা, পটকা ফাটাফাটি, কুকরি চালাচালি চলে কিছু সময় ধরে। তাতে না কুলোলে কখন কখন জান বাঁচাতে ফাঁদ কেটে বুনো বাচ্চা বনেই ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসতে হয়। জরুরী অবস্থায় ফাঁসের গিট খুলতে বা কাছি কাটতে দেরি হলেও বিপদ ঘটে। তাছাড়া অতি লোভে কখন কোন নির্বোধ ফাঁদির জান গিয়েছে এমন ঘটনাও বিরল নয়।

কিন্তু রূপসীর বাঁশ বনে ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম। এখানে বুনো হাতীর কোন দল ছিল না। ছিল মাত্র এক জোড়া দলছুট হাতী। এবং স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে বড় দাঁতালটা ছিল ছোটটার অভিভাবক বা রক্ষক। এই অভিভাবকত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হোল যখন দেখা গেল শুঁড় উঁচিয়ে গন্ধ নিয়ে শত্রুর উপস্থিতি বুঝতে পেরেই ছোট হাতীটা তার অভিভাবক অর্থাৎ বড়টার বিশাল দেহের আড়ালে সরে গিয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। বেশ চালাক বোঝা যাচ্ছে।

কৃষ্ণ ফাঁদি সবাইকে ইশারা করলো ও ফাঁকা দিয়ে কুনকি

চালিয়ে দু'চারটি বাঁশ ঝাড় বেড় দিয়ে উল্টো দিকে ঘুরে গেল। ফাঁদিরা যখন ঘুরছে বড় বুনোটা তখন শুঁড় উচিয়ে তাদের গন্ধ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটাকে আড়ালে রেখে বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে পাক খাচ্ছে। ফাঁদিদের পাঁয়তাবা কাটাচ্ছে আর কি। কখনই শত্রুর দিকে পেছন ফিরছে না।

মুণীন্দ্রবাবুকে বন্দুক বাগিয়ে রাখতে বলে কৃষ্ণ ফাঁদি অনুরূপ-ভাবে আরও দু'চারবার পাঁয়তারা দিল। কিন্তু ছোটটাকে কিছুতেই বড়টার কাছ থেকে আলাদা করা গেল না। হাতী ধরার দল যখন পাঁয়তারা বন্ধ করে, বড় দাঁতালটাও তখন নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে শুঁড় উচিয়ে গন্ধ শুঁকে শত্রুর পর-বর্তী মতলব বুঝবার চেষ্টা করে।

শত্রুপক্ষ সংখ্যায় বেশী।' কাজেই বিপদের গুরুত্ব কম নয়। এইরূপ অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে কতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায়। স্বীয় শক্তিতে পালাবার পথ করে নিতে হবে। বড় দাঁতালটা বাচ্চাটার চোখ মুখ ও শুঁড়ে শুঁড় বুলিয়ে জানোয়ারী ভাষায় কি যেন পরামর্শ করলে। হয়ত বা বললে—'ভাখ না একবার—ওদের মজাটা দেখাচ্ছি। তুই কিন্তু ভয় পাবিনি। সব সময় আমার পেছনে আড়ালে আড়ালে থাকবি।

শূন্যে শুঁড় উচিয়ে আবার গন্ধ নিলে দাঁতালটা। কুলোর মত কানদুটো তার সোজা হোল। এবার একপা দু'পা করে সে কৃষ্ণ ফাঁদির দিকে এগুতে লাগলো। নির্ভীক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে। বাচ্চাটা পেছনে। কৃষ্ণ ফাঁদি বোঝে পরিস্থিতি। আড়চোখে একবার মুণীন্দ্রবাবুর দিকে তাকায়। বাবু তার গুলিভরা বন্দুকের নলটা ঊর্ধ্বমুখী রেখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দাঁতালটার দিকে। ওদিকে বিমলা ব্রিজের উপর অসংখ্য কৌতূহলী লোকের ভীড়। তাদের দৃষ্টিপথে কোন বাধা নেই। সবাই দেখছে দাঁতাল এগুচ্ছে। আক্রমণের পূর্বলক্ষণ।

মুণীন্দ্র বড়ুয়া জীবনে এই প্রথম বুনো দাঁতালের সঙ্গে সামনা-সামনি লড়াইয়ে নামছেন। হাঁ, লড়াই বইকি। তবে এ লড়াই দাঁতালটিকে হত্যা নয়—বিতাড়িত করার। তবু বলা যায়—আক্রমণ যদি নেহাতই ঘটে সামলাতে হবে বই কি। কারণ দলের ছয়টি কুনকি হাতীসহ এতগুলি লোকের জীবনের নিরাপত্তা তাঁর উপরই নির্ভর করছে। মুণীন্দ্রবাবু সামনে কোলের ধারে রাখা রাইফেলটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

দাঁতালটা ধীর ও দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়েছে প্রায় তিরিশ চল্লিশ গজের মাথায়। কৃষ্ণ ফাঁদি সন্ত্রস্ত হোল। ওকে আর এগুতে দেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু দাঁতাল আরো দু'পাঁচ পা এগিয়ে এসে থমকে গেল। এইবার—হাঁ, এইবার সে নিশ্চয়ই ঝড়ের বেগে ছুটে আসবে। আর দেরি নয়। 'বাবু'—কৃষ্ণ ফাঁদির গলার স্বরে শেষ সঙ্কেত। মুণীন্দ্রবাবু তৈরীই ছিলেন। বন্দুকটা তুলেই দাঁতালটার সামনের ডান পায়ের নখের নিরিখে ছররার গুলি দাগলেন।

হাতীর পায়ের নখ নাকি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ঐ নখের উপর কোন কঠিন আঘাত হানলে হয়ত ওদের সারা দেহের মধ্যে শিহরণ জাগে। সে ক্ষেত্রে অনেক সময় ওরা পালিয়ে যায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে হোলও তাই। পায়ে গুলি লাগা মাত্রই দাঁতালটা ভয়ে বেহুঁসের মত হুড়মুড় করে ছুটে গিয়ে বিমলা ব্রীজ থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে গদাধর নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এদিকে বন্দুকের শব্দ ও বড় দাঁতালটার তড়িৎগতি অন্তর্ধানে ছোট দাঁতালটা বিভ্রান্ত হয়ে প্রাণভয়ে বাঁশ ঝাড়গুলির আরো ভিতরে গিয়ে আত্মগোপন করলো।

কুনকি হাতীর পিঠে বসে হাতী-ধরা দলের সবাই দেখলে বড় দাঁতালটা নদী সাঁতরে ওপারের দিকে চলেছে। সুযোগ বুঝে ফাঁদিরা বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে ছোটটাকে ঘিরে ফেললে। পাল্লার মধ্যে থাকলেও নিক্ষিপ্ত ফাঁসের দড়ি বার বার বাঁশের কঞ্চিতে আটকে

যায়। বাচ্চাটা এক ঝাড় থেকে অন্য ঝাড়ের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে। নাছোড়বান্দা ফাঁদিরাও কুনকি এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বার বার তাকে ঘিরে ফেলছে। বেশ উপভোগ্য তামাসা বটে। কিন্তু এ সময় কেউ কল্পনাও করেনি যে একটু পরেই এই বাঁশ বনের সামনে এক অতি রোমাঞ্চকর রক্তাক্ত ঘটনা সংঘটিত হতে চলেছে।

বিমলা ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে শত শত দর্শক এই তামাশা দেখছে। দেখছেন বড়ুয়া পরিবারের লোকরাও। তাঁদের সবারই নজর কখন বাঁশ বনের দিকে কখন বা দূরে মাঝ নদীতে, যেখানে পলায়নপর বড় দাঁতালটা তখনও সাপের ফণার মত শুঁড় উচিয়ে জল সাঁতরে ওপারের দিকে চলেছে।

নদীর দিকে পেছন ফিরে বাঁশ বনের লাগোয়া ফাঁকায় দাঁড়িয়ে কুনকি হাতীর পিঠে বসে মুণীন্দ্রবাবুও এক মনে ফাঁদিদের হাতী-ধরার কলাকৌশল দেখছেন। বুনো সর্দার হাতীটা পালিয়েছে। এতক্ষণ হয়ত সে নদী পেরিয়ে রূপসী পাহাড়ের দিকে পা চালিয়েছে। কাজেই বন্দুক ও ছররার কাজ ফুরিয়েছে। দ্বিতীয় নলের অব্যবহৃত গুলিটা বের করে নিয়ে মুণীন্দ্রবাবু বন্দুকটা হাতীর পিঠে গদির দড়িতে বেঁধে রাখলেন। কিন্তু প্রয়োজন না থাকলেও রাইফেলটা গুলি ভরে হাতে নিলেন। এটা তার শিকারী জীবনের সাবধানী স্বভাব বলা যেতে পারে।

একটা বাঁশ ঝাড়ের নীচে পাঁচটা কুনকির বেষ্টনী। এই পঞ্চরথীর ব্যূহ ভেদ করা হয়ত অসম্ভব। ব্যূহ ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে। ভেতরে বুনো বাচ্চাটা আতঙ্কে ছটফট করছে। সেও তো দাঁতাল, কিন্তু তার শক্তি সাহস এমন বেশি নয় ও কচি দাঁত দুটোও তার এমন পোক্ত নয় যে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে।

দীর্ঘকাণ্ড অসংখ্য বাঁশের গাঁট থেকে বেরুন অজস্র সরু সরু কঞ্চি চারিদিকে ছত্রাকারে ছড়িয়ে এমন বেড়াজালের সৃষ্টি করেছে যে ফাঁস চালানো অসম্ভব। দুটো কুনকি হাতীকে দুদিক থেকে এগিয়ে

নিয়ে চাপের মধ্যে ফেলে বাচ্চাটার গলায় ফাঁস পরাতে হবে। ওর রক্ষক দাঁতালটাতো উধাও। কাজেই সেদিককার ভয় নেই। জব্বর ঘেরে যখন পড়েছে তখন তাড়াহুড়োরও প্রয়োজন নেই। কৃষ্ণ ফাঁদি কায়দাটা সবাইকে বুঝিয়ে দিয়ে ফাঁস বাগিয়ে নিজের হাতীটাকে একটু এগিয়ে দিল। উল্টো দিকের ফাঁদিকে ইশারা করায় সেও তার হাতীটা নিয়ে একটু এগিয়ে এল। বেগতিক বুঝে আটকপড়া বাচ্চাটা দাপাদাপি সুরু করল ও প্রাণভয়ে তু' তিনবার চেঁচিয়ে ডেকে উঠল। তার চীৎকারের সেই তীক্ষ্ণ করুণ টানা সুর নদী পেরিয়ে দূর থেকে দূরান্তরে ছড়িয়ে গেল।

দাঁড়াও—আর এগিও না। একটু রয়ে সয়ে। এত দাপাদাপি ডাকাডাকির মধ্যে হড়বড় করে ফাঁস ছোঁড়ার দরকার নেই। উস্তাড়া করো না। একটু ধাতস্থ হোক বাচ্চাটা। যাবে কোথায়? ঘেরটাকে শক্ত রাখো যাতে ঠেলে বেরোতে না পারে। ধীরে সুস্থে যা হয় করা যাবে।'—কৃষ্ণ ফাঁদি অবস্থা অনুযায়ী সবাইকে নির্দেশ দেয়।

জানোয়ারের মনের কথা মানুষের জানা নেই। তবুও অনুমান —পলায়নপর বুনো দাঁতালটা হয়ত ভেবেছিল বাচ্চাটা সর্বক্ষণ তাকে অনুসরণ করেই আসছে। জানোয়ারী বুদ্ধি—পেছনে ফিরে দেখার প্রয়োজন মনে করেনি। তাই মাঝ নদীতে এসে পেছনে ফেলে আসা শত্রু অধ্যুষিত বাঁশ বনের দিক থেকে যখন তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সঙ্গীর ভয়ার্ত ক্রন্দনধ্বনি কানে এল তখনই সে চমকে উঠলো ও পরমুহূর্তে উল্টো দিকে ঘুরে আরো দ্রুতগতিতে নদীর জল ঠেলে তীরের দিকে ফিরে চললো সঙ্গীর সাহায্যে। বাঁশবনে বাচ্চাটাকে বাগে আনার ঝামেলায় অন্যমনস্ক থাকায় বুনো দাঁতালটা যে আবার ফিরে আসতে পারে এই সম্ভাবনার কল্পনা মুণীন্দ্রবাবু বা তাঁর ফাঁদিদের কারো মাথায় আসেনি।

কিন্তু ওদিক থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন গদাধর ব্রীজের উপর দণ্ডায়মান দর্শক এবং মুণীন্দ্রবাবুর মা ও পরিবারের অন্যান্যরা। ওদের

মধ্যে একটু চাঞ্চল্য ও গুঞ্জনও উঠেছিল। কিন্তু দাঁতালটা যে প্রতি আক্রমণের জন্য ফিরে চলেছে এটা কেউই ভাবতে পারেননি। তাই চেঁচিয়ে কেউ হাতীধরার দলকে সাবধানও করেননি। সে গুঞ্জন মুণীন্দ্রবাবুর কানেও এসেছিল। কিন্তু সেটা যে কোন বিপদের সঙ্কেত তা তিনি বুঝতে পারেননি।

বাচ্চা বুনোটা আর কতক্ষণ ভোগাবে? মুণীন্দ্রবাবু বাঁশ ঝাড়ের দিকে তাকিয়ে সেই কথাই যেন ভাবছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে গদাধর নদীর দিক থেকে একটি তীক্ষ্ণ ও কর্কশ বৃংহিত নিনাদ তাঁর কানে ভেসে এল। মুণীন্দ্রবাবু চমকে উঠলেন। চমকে উঠলেন দূরে বিমলা ব্রীজের উপর দণ্ডায়মানা তাঁর স্নেহশীলা মাতৃদেবীও। মা তাঁর সভয়ে দেখলেন—দাঁতালটা জলের কূলে পৌঁছে বালিয়াড়ি ভেঙ্গে এগিয়ে গিয়ে পাড়ের ঢালু বেয়ে উপরে উঠলো এবং সামনে পনের বিশ গজ দূরে ফাঁকায় তাঁর পুত্রের হাতীটাকে দেখেই একটি তীব্র ক্রোধব্যঞ্জক শব্দ করে তেড়ে গেল সেদিকে। মায়ের বুক এক গুরুতর অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো।

পুত্র মুণীন্দ্রের সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি ও রাইফেলের লক্ষ্যভেদের উপর তাঁর বিশ্বাস আছে। যুবক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পিতৃদেব রাজাবাহাদুর প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার নেতৃত্বাধীনে বহু শিকার প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন। হিংস্র ব্যাঘ্র শিকারের বহু লোমহর্ষক পরিস্থিতির মধ্যে রাইফেলধারী মুণীন্দ্রকে দেখেছেন তিনি নির্ভীক অচঞ্চল ও স্থিরলক্ষ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে দাঁতালটা আক্রমণ করছে আচমকা তার পেছন দিক থেকে। হায়রে—কি সর্বনাশই না জানি আজ ঘটে যায়।

দূরাগত হাতীর ডাকে ক্রোধোন্মত্ততার আভাস। সে আওয়াজ কানে আসা মাত্রই মুণীন্দ্রবাবু পেছনে তাকিয়েই বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে লক্ষ্য করলেন যে পলাতক সেই বুনো দাঁতালটাই আবার ফিরে এসেছে, এবং শুঁড় গুটিয়ে অরণ্য দৈত্যের মত তেড়ে আসছে তাঁরই

হাতীকে লক্ষ্য করে। মধ্যপথে তাকে রুখতে না পারলে তার তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ দন্তের প্রথম আঘাতে নিজের বাহন কুনকি হাতীটাতো ভূতলশায়ী হবেই—পরবর্তী উপর্যুপরি আক্রমণে বন্ধু অজিত ও হতভাগ্য মাহুতটিসহ নিজের মৃত্যু অবধারিত। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সে মৃত্যু হবে নিশ্চিতই অতি যন্ত্রণাদায়ক ও বীভৎস।

হাতীর পিঠে বসে মুণীন্দ্রবাবু নিজের দেহকে যেভাবে ঘুরিয়ে পেছনে তাকিয়েছিলেন শিকারীসুলভ ক্ষিপ্রতায় সেই অবস্থাতেই রাইফেলটিও তাঁর যন্ত্রচালিতের মত কাঁধে উঠে এসেছিল। সামনে ঝড় এগুচ্ছে উদ্দাম গতিতে। রাইফেলের নিশানালাইন মেলাবার আর সময় নেই—সম্ভবও নয়। অভ্যস্ত হাতে রাইফেলের নলটি তাঁর লক্ষ্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছে আক্রমণমুখী দাঁতালটার কপালের নিম্নভাগে শুণ্ডের সংযোগস্থলে। পর মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে জানান দিয়ে একটি উত্তপ্ত বুলেট নক্ষত্রবেগে ছুটে গিয়ে আঘাত করলো হাতীর সম্মুখ-ভাগে নির্দিষ্ট স্থানে।

হাতীর আক্রমণমুখী প্রচণ্ড রোখ স্তব্ধ হয়নি। সে এখনও ছুটে আসছে দুরন্ত তেজে। আর রক্ষা নেই। শেষ ভরসা রাইফেলের দ্বিতীয় ট্রিগারের কোলে শিকারীর আঙ্গুলের মৃদু স্পর্শ। কিন্তু ট্রিগারটি চাপবার পূর্বেই একটি বিশাল পাথরের ধ্বসের মত দাঁতালের দেহটা এসে হুমড়িখেয়ে পড়লো মুণীন্দ্রবাবুর হাতীর ঠিক পেছনে মাত্র গজ পাঁচেক দূরে। দাঁত দুটো তার সিঁধিয়ে গেল মাটির মধ্যে এক দেড় হাত গভীরে। কপালের ক্ষতস্থান থেকে নেমেছে রক্তের ধারা।

বন্ধু অজিত কোথায়? সে তো পেছনেই বসেছিল। গেল কোথায়? জীবন-মরণ বিপদের মধ্যে মুণীন্দ্রবাবুর অন্য কোন হুঁস ছিল না। তবে কি অজিত কুনকির পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে দাঁতালটার হুমড়িখাওয়া দেহের নীচে চাপা পড়েছে? কি সর্বনাশ? মুণীন্দ্রবাবু একটু পেছন দিকে ঝুঁকে লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখলেন—না, অজিত বেঁচে আছে। নিজেদের হাতীর লেজ ধরে সে পেছন দিকে ঝুলছে।

মুণীন্দ্রবাবু তাকে টেনে তুললেন। কি জানি কিভাবে অজিতের হাতের তালু কেটে রক্তারক্তি হচ্ছে। তার হেফাজতে রাখা রাইফেলটা মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তা যাক—ওটাকে না হয় পরে তোলা যাবে।

দাঁতালটা মাটিতে দাঁত গুজে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে তখনও। মুণীন্দ্রবাবু জরুরী নির্দেশ দিলেন মাহুতকে নিজেদের হাতীকে অবিলম্বে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। মাহুত করলোও তাই। বিপদ বুঝে ওদিকে বাঁশ বন থেকে কৃষ্ণ ফাঁদিসহ সবাই উধাও হয়েছে তাদের বাহন নিয়ে। বুনো বাচ্চাটা সুযোগ পেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে কোন একটা ঝাড়ের আড়ালে।

দূরে দাঁড়িয়ে মুণীন্দ্রবাবু লক্ষ্য করছেন ভূতলশায়ী দাঁতালটাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত পেটের ওঠানামা দেখা যায়। তাহলে বেঁচে আছে এখনও। দশ পনর মিনিট পরে একটু দম নিয়ে সে আবার শান্ত-ভাবে উঠে দাঁড়ালো। কপালের মধ্যস্থল থেকে রক্তের কয়েকটি ধারা নেমে এসে দু'চোখের পাশ দিয়ে ও শুঁড় বেয়ে নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে। ধীর পায়ে সে এগিয়ে গেল বাঁশ বনের দিকে। খুঁজে বের করলে সে তার ভীত-বিহ্বল স্নেহাস্পদ সঙ্গীটিকে। নিজ রক্তাক্ত দেহের আড়ালে রেখে তাকে নিয়ে সে আবার বেরিয়ে এল বাঁশ বনের সীমানায়। দৃঢ় পদক্ষেপে সে বন প্রদক্ষিণ করে এগিয়ে গিয়ে পুনরায় শত্রুর সম্মুখীন হোল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই পশুটিকে দেখে তখন মনে হচ্ছিল আরণ্যক জীবনের অপত্যস্নেহের স্বর্গীয় মাধুর্যে-ভরা সে যেন এক অতি করুণ প্রতিমূর্তি। অথচ অন্যদিকে সে তখনও ঐ গুরুতর আহত অবস্থাতেও শত্রুর প্রতি নির্মম ক্ষমাহীন ও আক্রমণমুখী।

আমার কাছে ঘটনার বিবরণ দেবার সময় এই পর্যায়ে এসে মুণীন্দ্রবাবুর মনটা যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তিনি সখেদে বললেন—যাই হোক না কেন তাকে হত্যা করতে আমি চাইনি।

তার দাঁত জোড়ার প্রতিও আমার কোন লোভ ছিল না। তখনও পর্যন্ত সে মানুষের জীবন বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি করেছিল বলে আমি খবর পাইনি। প্রথম থেকে তাকে আমি তাড়িয়ে দিতেই চেয়েছিলাম। আমাদের জীবনহানি ঘটাতে উদ্যত না হলে তার প্রতি আমি রাইফেলের গুলিও নিক্ষেপ করতাম না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার প্রথম গুলিতে সে মরলো না—গুরুতররূপে আহত হোল।

এই অসীম পরাক্রমশালী বন্যপ্রাণীটি আমারই আঘাতে আহতবস্থায় রক্তাক্ত দেহে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে বা পঙ্গু হয়ে তিলে তিলে মরবে এটাও আমি চাইছিলাম না। তাই আমার রাইফেলের দ্বিতীয় গুলির আঘাতে সেই মুহূর্তে তাকে সর্ব-যন্ত্রণার জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি দিতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। এটা আমার রুটিন শিকার ছিল না। তাই মনটাও রক্তপাতের জন্য তৈরী ছিল না। কাজেই স্নেহপ্রবণ ও মানুষের সেবাপরায়ণ মহাশক্তিধর এই বন্য পশুটির উপর সেদিন যে আমাকে মৃত্যু আঘাত হানতে হয়েছিল সে কথা চিন্তা করে আজও আমি বিবেকের দংশন অনুভব করি।'

রক্ষকের মৃত্যুর পর বাচ্চাটা বাঁশবন ছেড়ে পালিয়ে যায়। মুণীন্দ্রবাবু তাকে আর ধরবার চেষ্টা করেন নি।

নিহত দাঁতালটা উচ্চতায় ছিল নয় ফুট দশ ইঞ্চি। অবাঞ্ছনীয় ও অপ্রত্যাশিত ঘটনার মাধ্যমে হলেও এইটাই ছিল মুণীন্দ্রবাবুর শিকার তালিকায় প্রথম হাতী।

—শেষ-